অধ্যায় ৯

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা
Continuation of Human Life

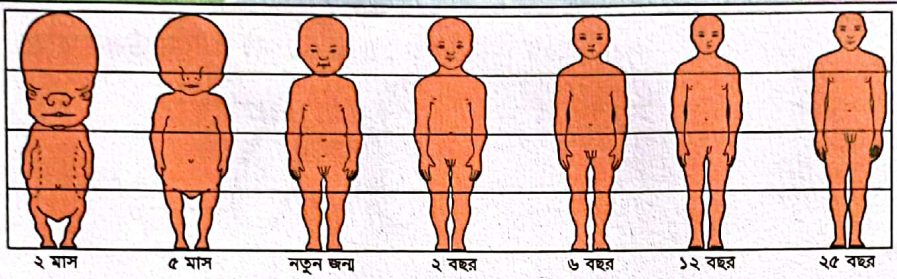

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- বয়ঃসন্ধিকাল
- নিষেক
- গ্যাস্ট্রুলেশন
- গর্ভ নিরোধক
- রজঃচক্র
- ইমপ্ল্যান্টেশন
- ভ্রূণীয় স্তর
- IVF
- সিফিলিস
- গনোরিয়া

প্রজনন প্রক্রিয়ায় জীব নিজ সত্তাবিশিষ্ট অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে নিজ প্রজাতির স্থায়িত্ব বজায় রাখে। মানুষের বংশবৃদ্ধি যৌন জনন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। এদের পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করে। এ অধ্যায়ে মানুষের পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র, যৌনবাহিত রোগ এবং প্রজননজনিত সমস্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া	পাঠ ১	পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া
❐ প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশার বর্ণনা	পাঠ ২	স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া
❐ গর্ভাবস্থায় করণীয় দিকসমূহ	পাঠ ৩	প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা
❐ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন	পাঠ ৪	গ্যামেটোজেনেসিস, নিষেক ও ইমপ্ল্যান্টেশন
❐ আই.ভি.এফ পদ্ধতির উপযোগিতা	পাঠ ৫	ভ্রূণ গঠন ও তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি; গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা
❐ প্রজননজনিত সমস্যাসমূহের প্রতিকার	পাঠ ৬	গর্ভ নিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা
❐ যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার	পাঠ ৭	আই.ভি.এফ পদ্ধতি; কৃত্রিম গর্ভধারণ
❐ প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং এর সুস্থতা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া	পাঠ ৮	প্রজননতন্ত্রের সমস্যা
	পাঠ ৯	পুরুষ ও নারীর প্রজননে হরমোনের ভারমাস্যহীনতা
	পাঠ ১০	সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস

ক. পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System)

মানুষে শুক্রাণু উৎপাদন, সঞ্চয় ও পরিবহন কাজের ভিত্তিতে পুরুষ জননতন্ত্রকে দুভাবে ভাগ করা যায়: **মুখ্য** (primary) ও **আনুষঙ্গিক** (accessory)। যে অঙ্গ শুক্রাণু উৎপন্ন করে তাকে **মুখ্য জনন অঙ্গ**; এবং যে সব অঙ্গ শুক্রাণু সঞ্চয় ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত সেগুলোকে **আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ** বলে।

শুক্রাশয় হচ্ছে মুখ্য জননাঙ্গ, বাকি অঙ্গগুলো আনুষঙ্গিক। পুরুষ জননতন্ত্র নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. শুক্রাশয় (Testes) : একজোড়া ডিম্বাকার শুক্রাশয় **স্ক্রোটাম** (scrotum) নামক একটি থলির ভিতর আবদ্ধ এবং শুক্ররজ্জু দিয়ে লাগানো অবস্থায় দু'পায়ের উরুসন্ধিতে উপাঙ্গের মতো ঝুলে থাকে। স্ক্রোটামের ভিতর শুক্রাশয়দুটি পাশাপাশি অবস্থান করে। বাম দিকে স্ক্রোটাম বড় ও কিছুটা ঝোলা। প্রতিটি শুক্রাশয় লম্বায় প্রায় ৪ সে.মি. ও ১০-১২ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট। প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভিতরে প্রায় ১০০০টি সূক্ষ্ম ও প্যাঁচানো **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules) থাকে। এরা ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বা লেডিগ কোষ (Leydig cells)-এ ডুবানো থাকে। সেমিনিফেরাস

নালিকা কতকগুলো সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়ে এক জালিকাকার গঠন সৃষ্টি করে, একে রেটি টেসটিস (rete testis) বলে। রেটি টেসটিস থেকে প্রায় বিশটি ৪-৬ মিলিমিটার লম্বা সংগ্রাহক নালি সৃষ্টি হয়ে প্রত্যেক শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশ থেকে শুক্রাশয় ত্যাগ করে এপিডিডাইমিসে মিলিত হয়। সংগ্রাহক নালিগুলোকে ভাসা ইফারেন্সিয়া (vasa efferentia) বলে।

কাজ : সেমিনিফেরাস নালিকা স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন করে। শুক্রাশয়ের লেডিগ কোষ টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে। মানুষের শুক্রাশয় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫০০ শুক্রাণু উৎপন্ন করে।

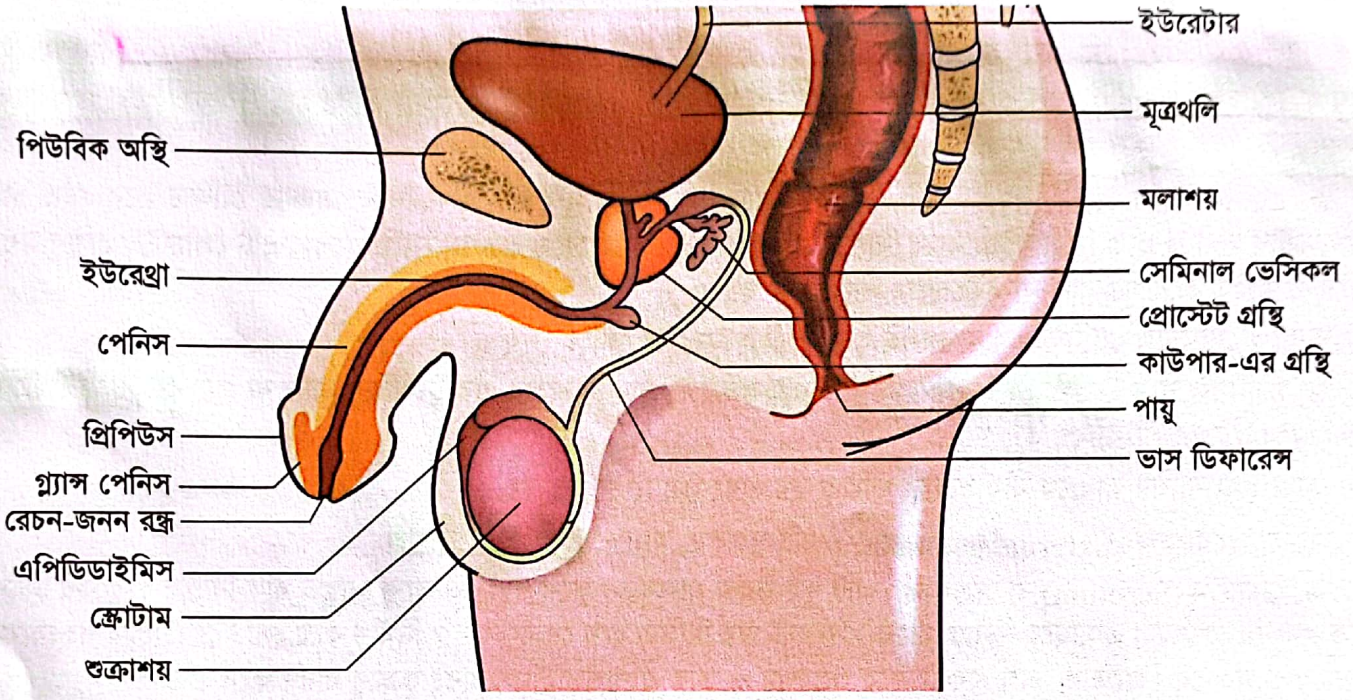

চিত্র ৯.১ : পুংজননতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

২. এপিডিডাইমিস (Epididymis) : প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভাসা ইফারেন্সিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে ৪-৬ মিটার লম্বা অত্যন্ত প্যাঁচানো এপিডিডাইমিস গঠন করে। এপিডিডাইমিস তিন অংশে বিভক্ত–

ক. মস্তক বা ক্যাপুট এপিডিডাইমিস (Head or Caput epididymis) : এটি সেমিনিফেরাস নালিকার সাথে যুক্ত থাকে।

খ. দেহ বা মধ্য এপিডিডাইমিস (Body or Middle epididymis) : এটি এপিডিডাইমিসের মাঝের অংশ।

গ. লেজ বা কওডা এপিডিডাইমিস (Tail or Cauda epididymis) : এটি শুক্রনালির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : এপিডিডাইমিস শুক্রাণুর ভিতর থেকে তরল ও কঠিন অসার পদার্থ আলাদা করে শুক্রাণুর নিষেক ক্ষমতা বাড়ায় এবং পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করে এগুলোকে সতেজ রাখে।

৩. ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens) বা শুক্রনালি : প্রতিটি এপিডিডাইমিস প্রায় ৪০-৫০ সেন্টিমিটার লম্বা, বড় গহ্বর ও মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট একেকটি ভাস ডিফারেন্স-এ উন্মুক্ত হয়। ভাস ডিফারেন্স শ্রোণিগহ্বরে প্রবেশ করে এবং মূত্রথলির উপর

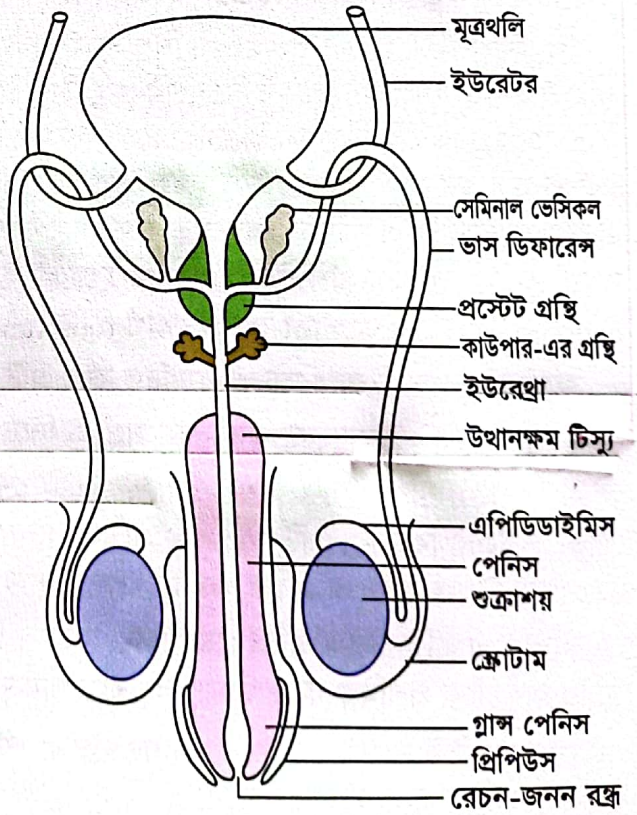

চিত্র ৯.২ : পুংজননতন্ত্র (সম্মুখ দৃশ্য)

CamScanner

বেঁকে অবস্থান করে। মূত্রনালি অতিক্রম করার পর **অ্যাম্পুলা** (ampulla) নামক একটি মাকু আকৃতির ফোলা অংশ গঠন করে। অ্যাম্পুলা পরে সেমিনাল ভেসিকলে যুক্ত হয়।

কাজ : প্রধান কাজ হচ্ছে সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রাণু পরিবহন করা। তবে কিছু সময়ের জন্য শুক্রাণু জমাও রাখে।

৪. সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle) : শ্রোণিগহ্বরে মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একজোড়া লম্বাকৃতির, পেশিময়, থলিকাকার গ্রন্থিকে **সেমিনাল ভেসিকল** বলে। এটি একটি ক্ষুদ্র নালি দ্বারা শুক্রনালির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : এটি শুক্রাণুকে ধারণ করার জন্য পিচ্ছিল ও সান্দ্র **সেমিনাল তরল** (seminal fluid) ক্ষরণ করে যার ৭০% **বীর্য বা সিমেন** (semen) গঠন করে। বীর্যের প্রধান উপাদান হলো প্রোস্টাগ্লান্ডিন, ফ্রুক্টোজ, সাইট্রেট, ইনোসিটল ও কয়েক ধরনের প্রোটিন। এসব পদার্থ শুক্রাণুকে পুষ্টি প্রদান করে।

৫. ক্ষেপন নালি (Ejaculatory duct) : শুক্রনালি ও সেমিনাল ভেসিকলের নালি একত্রে মিলিত হয়ে প্রায় ১৯ মিলিমিটার লম্বা ও ০.৩ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট যে নালি গঠন করে তাকে **ক্ষেপন নালি** বলে। এটি প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে মূত্রনালি বা ইউরেথ্রার সাথে যুক্ত হয়।

কাজ : সেমিনাল ভেসিকলের ক্ষরণসহ শুক্রাণুকে ইউরেথ্রায় পৌঁছে দেয়।

৬. মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : এটি রেচনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের একটি অভিন্ন নালি যা প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং শিশ্নের শীর্ষদেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : এ নালির মাধ্যমে বীর্য বাইরে স্খলিত হয় এবং মূত্র নিষ্কাশিত হয়।

৭. বহিঃযৌনাঙ্গ (External genitalia) : এটি দুরকম, যথা– **স্ক্রোটাম ও শিশ্ন**।

ক. স্ক্রোটাম (Scrotum) বা অন্ডথলি : এটি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা ও ত্বকে আবৃত থলি বিশেষ। ত্বকের নিচে পাঁচ ধরনের পেশিস্তর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত থাকে। সবকটি স্তর মিলিত হয়ে যে ব্যবধায়ক নির্মাণ করে সেটি স্ক্রোটামের গহ্বরকে দুভাগে ভাগ করে। প্রত্যেক ভাগ একটি করে শুক্রাশয় ও তার এপিডিডাইমিস এবং শুক্রাণু ধারণ করে।

কাজ : স্ক্রোটাম শুক্রাণু উৎপন্নের অনুকূল তাপমাত্রা রক্ষা করে। শুক্রাশয়কে চাপজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চাপের মুখে শুক্রাশয় থলির ভিতর সহজেই পিছলে যেতে পারে।

খ. শিশ্ন (Penis) বা পুরুষাঙ্গ : শিশ্ন হচ্ছে পুরুষের এমন একটি বহিরাঙ্গ যার ভিতর দিয়ে ইউরেথ্রা অতিক্রম করে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এর ত্বকের নিচে চর্বি নেই কিন্তু পাতলা টিস্যু আছে। তাই শিশ্নের ত্বক আলগা থাকে। যে অংশ থেকে শিশ্ন উঠেছে তাকে **শিশ্নমূল** (root) বলে। সেখানে কয়েক গোছা চুল থাকে। শিশ্নের যে অংশ ঝুলে থাকে, সেটি **শিশ্নদেহ**। এর ডগায় ব্যাঙের ছাতা আকৃতির লাল মুন্ডিকে **গ্লান্স পেনিস** (glans penis) বলে। এতে সবচেয়ে বেশি স্নায়ুর প্রান্তদেশ উন্মুক্ত। এ মুন্ডিকে যে চামড়া ঢেকে রাখে তার নাম **প্রিপিউস** (prepuce)। মুসলমান পুরুষে এ অংশটি খতনার সময় কেটে ফেলা হয়। শিশ্নদেহ দুধরনের **ইরেকটাইল** (erectile) টিস্যুতে গঠিত: (i) **কর্পোরা ক্যাভারনোসা** (corpora cavernosa) ও (ii) **কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম** (corpora spongiosum)। এ টিস্যু দৃঢ় হলে শিশ্ন প্রসারিত হয়।

কাজ : প্রজনন ক্রিয়ায় দৃঢ় ও প্রসারিত হয়ে এটি ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য স্ত্রী জননতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

৮. জনন গ্রন্থি : মানুষের জননানালি সংশ্লিষ্ট নিচে বর্ণিত দুটি গ্রন্থি পাওয়া যায়।

ক. প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland) : এটি শ্রোণিগহ্বরে মূত্রথলির নিচে অবস্থিত নাশপাতি আকৃতির গ্রন্থি এবং গোড়া ও চূড়ায় বিভক্ত। এটি পেশল ও গ্রন্থিময় টিস্যুতে গঠিত। গ্রন্থিময় টিস্যু কতকগুলো খন্ডযুক্ত। খন্ডগুলোর নালিকা ইউরেথ্রায় উন্মুক্ত হয়। এ গ্রন্থির ক্ষরণ পেশল টিস্যুর সঙ্কোচনে ইউরেথ্রায় মুক্ত হয়।

কাজ : এ গ্রন্থি থেকে একধরনের ক্ষারীয় তরল নিঃসৃত হয় যা বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং যোনির ভিতরের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে শুক্রাণুকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে।

খ. বাল্বোইউরেথ্রাল (Bulbo-urethral) বা কাওপার-এর গ্রন্থি (Cowper's gland) : এ গ্রন্থি হচ্ছে ইউরেথ্রার দুপাশে অবস্থিত দুটি মটর দানার মতো গ্রন্থি যা থেকে নালিকা বেরিয়ে ইউরেথ্রায় মিলিত হয়।

কাজ : সঙ্গমের সময় এ গ্রন্থি থেকে মিউকাস (পিচ্ছিল পদার্থ) নিঃসৃত হয় যা যোনিপথকে পিচ্ছিল রাখে।

CamScanner

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Action of Male Reproductive System)

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন হরমোন ও সেগুলোর কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotrophin Releasing Hormone, GnRH) : মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত এ হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থিকে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ও লুটিনাইজিং হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়। এটি শুক্রাণু উৎপাদন ও টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে।

২. ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (Follicle Stimulating Hormone, FSH) : পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকাকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণুজনন (spermatogenesis) ঘটায়। এটি শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত সারটলি কোষের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা জোগায়।

৩. লুটিনাইজিং হরমোন (Luteinizing Hormone, LH) : পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে ক্ষরিত এ হরমোন শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষকে উদ্দীপিত করে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে।

৪. লুটিওট্রফিক হরমোন (Luteotrophic Homone, LTH) : পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত এ হরমোন গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

৫. গোনাডোকর্টিকয়েড হরমোন (Gonadocorticoid Hormone) : অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি নিঃসৃত এ হরমোন পুংজননাঙ্গের পূর্ণতা আনে ও গৌণ (secondary) যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

৬. অ্যান্ড্রোস্টেরন হরমোন (Androsteron Hormone) : শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত এ হরমোন পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং শুক্রাণু সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৭. টেস্টোস্টেরন হরমোন (Testosteron Hormone) : শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত এ হরমোন পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং শুক্রাণু সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৮. ইনহিবিন হরমোন (Inhibin Hormone) : শুক্রাশয়ের সারটলি কোষ থেকে ক্ষরিত এ হরমোন GnRH ও LH ক্ষরণ মাত্রা হ্রাস করে।

খ. স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female Reporoductive System)

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. ডিম্বাশয় (Ovary) : শ্রোণির পিছনে ফাঁপা গহ্বরে জরায়ুর দুপাশে ইউরেটারের নিচে বাদাম আকৃতির একজোড়া ডিম্বাশয় অবস্থিত। প্রত্যেক ডিম্বাশয় ৩–৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ২–৩ সেন্টিমিটার চওড়া ও ০.৬-১.৫ সেন্টিমিটার পুরু এবং জরায়ু ও ফেলোপিয়ান নালিসহ উদরে একটি পেরিটোনিয়াম পর্দার ভাঁজ করা টিস্যুর সাহায্যে আটকে থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ওজন ২.০–৩.৫ গ্রাম।

কাজ : ডিম্বাণু উৎপন্ন করা ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ। তাছাড়া স্ত্রী যৌন হরমোন–ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ করে থাকে। এসব হরমোনের প্রভাবে রজঃচক্র, গর্ভ, অমরা, জননেন্দ্রিয়, মাতৃস্তন পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালি (Fallopian tube) : জরায়ুর দুপাশে দুটি পেশল ও ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ডিম্ব-নালি অবস্থিত। নালির একপ্রান্ত ডিম্বাশয়ের কাছে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে ও অন্যপ্রান্ত জরায়ু-গহ্বরে উন্মুক্ত। ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রান্তটি অসংখ্য আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধনযুক্ত হয়ে ঝালর বা ফিমব্রি (fimbriae)-তে পরিণত হয়। পরের ফানেলাকার অংশটি ইনফান্ডিবুলাম (infundibulum)। এর স্ফীত অংশ অ্যাম্পুলা (ampulla) এবং যে মধ্য অংশটি জরায়ু-প্রাচীরের কাছে থাকে তা ইসথমাস (isthmus)।

কাজ : ডিম্বনালি ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত পরিণত ডিম্বাণু গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌঁছে দেয় এবং রস ক্ষরণ করে শুক্রাণুকে উর্ধ্বপ্রান্তে উঠে ডিম্বাণুকে নিষিক্তকরণে সাহায্য করে।

৩. জরায়ু (Uterus) : এটি দেখতে উল্টানো নাশপাতির মতো, ফাঁপা, মাংসল অঙ্গ এবং মূত্রাশয়ের পিছনে ও মলাশয়ের সামনে শ্রোণিগহ্বরে অবস্থিত। জরায়ু-প্রাচীর বহিঃস্থ পেরিমেট্রিয়াম (perimetrium), মধ্যস্থ মায়োমেট্রিয়াম

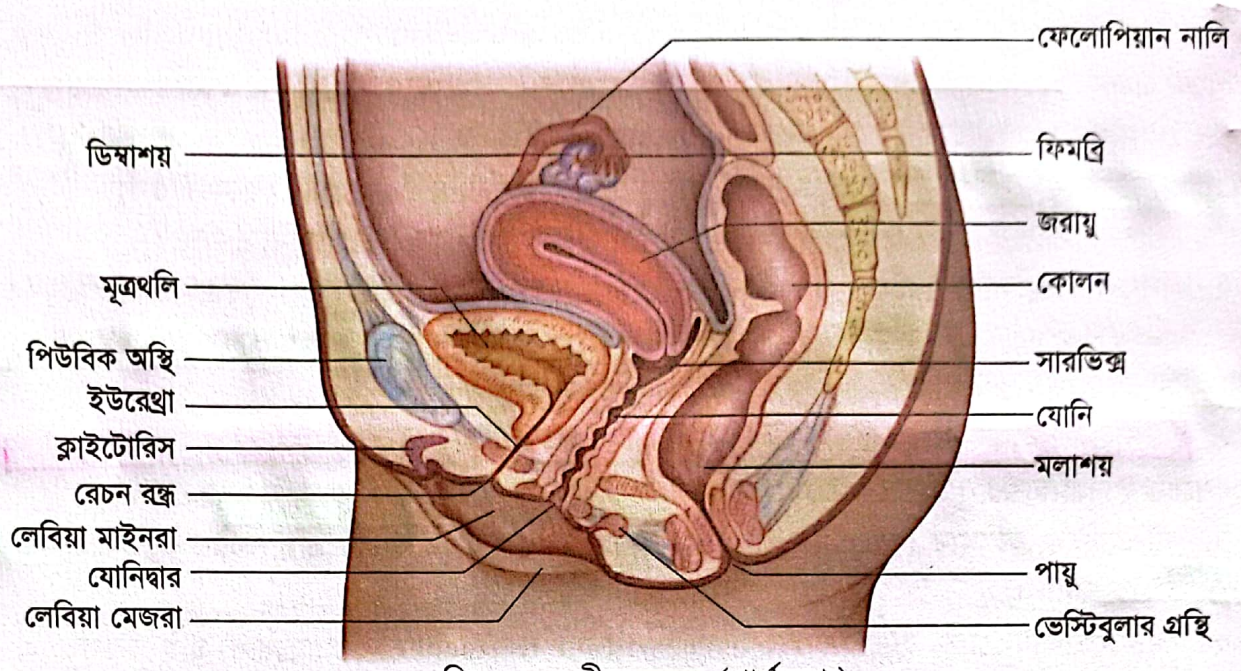

চিত্র ৯.৩ : স্ত্রীজননতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

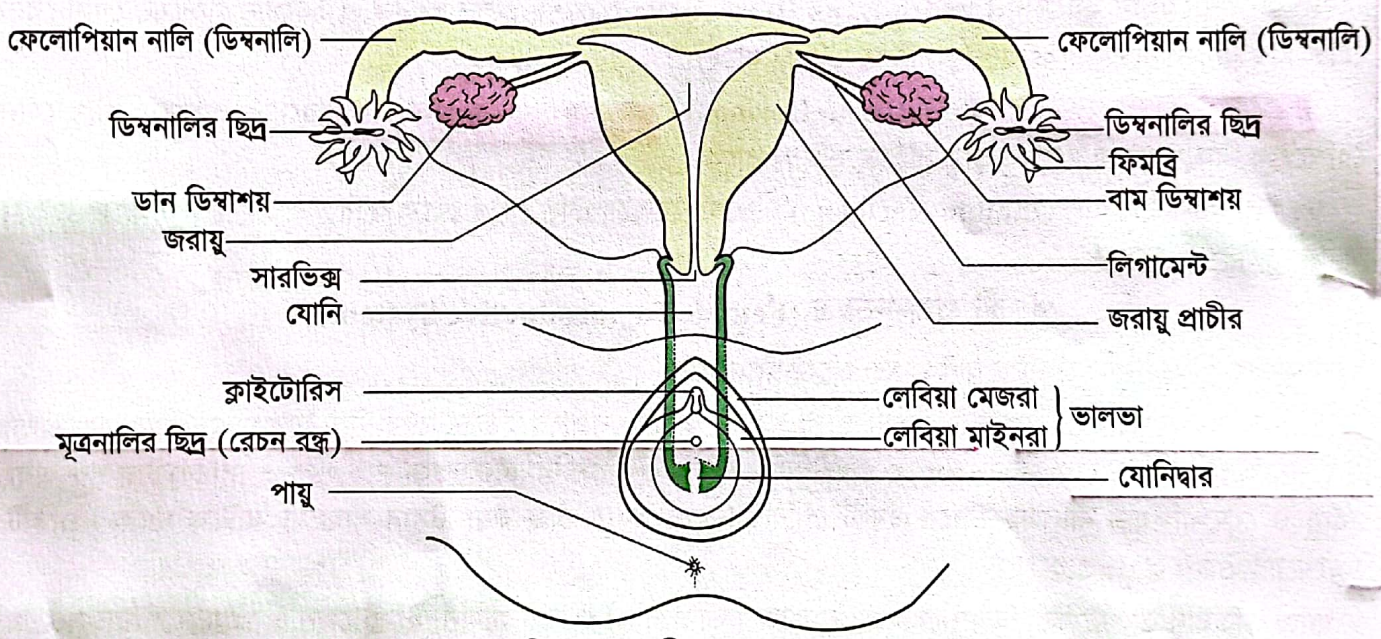

চিত্র ৯.৪ : স্ত্রীজননতন্ত্র (সম্মুখ দৃশ্য)

(myometrium) এবং অন্তঃস্থ **এন্ডোমেট্রিয়াম** (endometrium)-এ গঠিত। জরায়ুর উপর দিকে গম্বুজ আকৃতির অংশকে **ফান্ডাস** (fundus), মাঝের অংশকে **জরায়ুদেহ** (body of uterus) এবং নিচের অংশকে **সারভিক্স** (cervix) বা **জরায়ুকণ্ঠ** বলে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে জরায়ু পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় এটি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

কাজ : জরায়ু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভ্রূণকে আগলে রক্ষা করে এবং পরিস্ফুটন সম্ভবপর করে তোলে। এখান থেকে অমরা সৃষ্টি হয়ে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন করে। শুক্রাণুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে। সারভিক্সের নিঃসৃত ক্ষারকীয় রস শুক্রাণুর চলনশক্তি বৃদ্ধি করে।

৪. যোনি (Vagina) : এটি শুক্রাণু গ্রহণের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীদেহের একটি মাংসল, ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার খাদ যা মূত্রাশয়ের নিচ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত জরায়ু থেকে বাইরে উন্মুক্ত। যোনির প্রাচীরে রুগী (rugae) নামক অসংখ্য ভাঁজ থাকে।

CamScanner

কাজ : যোনি মাংসল প্রাচীরের সাহায্যে যে কোনো আকারের শিশ্নকে গ্রহণ করে। বীর্য স্খলনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রদান করে, স্খলিত বীর্য গ্রহণ করে এবং প্রসব ঝামেলামুক্ত করে।

৫. বহিঃযৌনাঙ্গ (External genitalia) : যোনির মুখে স্নায়ুসমৃদ্ধ কতকগুলো অঙ্গ দেখা যায়, এগুলোকে একত্রে **ভালভা** (vulva) বলে। দুজোড়া মাংসল ভাঁজ উভয় পার্শ্ব থেকে যোনিপথকে কপাটের মতো ঢেকে রাখে। এদের মধ্যে বাইরের অধিকতর মোটা এবং বৃহদাকার ভাঁজকে **লেবিয়া মেজরা** (labia majora) এবং ভিতরের দিকে তুলনামূলকভাবে পাতলা এবং ক্ষুদ্র ভাঁজকে **লেবিয়া মাইনরা** (labi minora) বলে।

লেবিয়া মেজরার একেবারে উপরে জোড়ের কাছে একটি উঁচু ছোট মাংসপিন্ড দেখা যায়, একে **ক্লাইটোরিস** (clitoris) বা **ভগাংকুর** বলে। **বার্থোলিন গ্রন্থি** (Bartholin's gland) নামে দুটি বড় গ্রন্থিও লেবিয়া মাইনোরায় উন্মুক্ত হয়েছে।

কাজ: লেবিয়া মেজরা ও লেবিয়া মাইনরা যোনিপথকে ঢেকে রাখে। বার্থোলিন গ্রন্থিক্ষরণ যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তোলে। ক্লাইটোরিস সঙ্গমের সময় উত্তেজনা প্রদান করে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Action of Female Reproductive System)

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের কার্যাবলি বিভিন্ন হরমোনের ক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়। কিছু হরমোন সরাসরি প্রজনন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কিছু হরমোন অন্য হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। যেসব হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা মানব স্ত্রীজননতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে নিঃসৃত হরমোন **গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন** (GnRH) অগ্র পিটুইটারিকে উদ্দীপিত করে, ফলে **লুটিনাইজিং হরমোন** (LH) ও **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) নিঃসৃত হয়।

২. FSH ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলিকে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

৩. **ইস্ট্রোজেন হরমোন** মেয়েদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়, ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও এটি জরায়ুর প্রাচীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে।

৪. LH **হরমোন** ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়ামকে উদ্দীপিত করে প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে।

৫. **প্রোজেস্টেরন হরমোন** বয়ঃসন্ধিতে জরায়ুর প্রাচীরের পরিবর্তন ঘটায় এবং জরায়ুর প্রাচীরকে ভ্রূণ ধারণ উপযোগী করে। এটি গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়। রক্তে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বেড়ে গেলে GnRH ক্ষরণ হ্রাস পায় যা FSH ও LH ক্ষরণে বাঁধা সৃষ্টি করে।

৬. ডিম্বাশয় ও অমরা থেকে **রিল্যাক্সিন হরমোন** নিঃসৃত হয়। এটি প্রসবের সময় শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে প্রসব সহজ করে।

৭. **অগ্রপিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অক্সিটোসিন হরমোন** জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটিয়ে সন্তান ও অমরার বাইরে নির্গমনের সহায়তা করে।

প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা (Different Stages and Phases of Reproduction)

মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। যৌন জনন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ভিন্নধর্মী গ্যামেট সৃষ্টি ও নিষেকের মাধ্যমে গ্যামেটের নিউক্লিয়াসের একীভবনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট **জাইগোট** (zygote) দ্রুত বিভাজিত হয়ে **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst) নামক কোষগুচ্ছে পরিণত হয়। এটি ফেলোপিয়ান নালির ভিতর দিয়ে বাহিত হয়ে **ইমপ্ল্যান্টেশন** (implantation) প্রক্রিয়ায় জরায়ুগাত্রে স্থাপিত হলে **গর্ভধারণ** সম্পন্ন হয়। এরপর শুরু হয় **ভ্রূণ** গঠন প্রক্রিয়া। ভ্রূণ গঠনের প্রাথমিক ধাপেই তিনটি ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয়। এ তিনটি স্তর থেকেই পরবর্তীতে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয়। এ কারণে ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালীন দশাটি মানবজননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

মানব প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা সাতটি শিরোনামের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়। যেমন– ১. বয়ঃসন্ধিকাল, ২. রজঃচক্র, ৩. গ্যামেট সৃষ্টি, ৪. নিষেক, ৫. ইমপ্ল্যান্টেশন, ৬. ভ্রূণের পরিস্ফুটন এবং ৭. ভ্রূণের বিকাশ।

CamScanner

১. বয়ঃসন্ধিকাল বা বয়ঃপ্রাপ্তি (Puberty or Adolescence)

কৈশোর অতিবাহিত হওয়ার পরপরই নারী-পুরুষের দেহে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরবৃত্তীয় অনেক পরিবর্তন শুরু হয়। ফলে যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের পুনঃবর্ধণ ঘটে। জীবনের যে পর্যায়ে নারী ও পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (secondary sexual characteristics) উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। অর্থাৎ কৈশোর এবং সাবালকত্ব প্রাপ্তির অন্তবর্তীকালীন সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল (puberty is the time between childhood and adulthood)। পুষ্টি, সামাজিক অবস্থা, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং বংশগত কারণে পৃথিবীর সব অঞ্চলে নারী-পুরুষের বয়ঃসন্ধিকাল একই সময় হয় না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের বয়স ১৩–১৫ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১–১৩ বছর বলে বিবেচনা করা হয়। শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের এ ঘটনা আরো ৩–৪ বছর পর ঘটে। বয়ঃসন্ধিকালে জননাঙ্গের হরমোন নিঃসরণ ও গ্যামেট উৎপাদনের সূচনা ঘটে। শিশু-কিশোর বিশেষজ্ঞ James M. Tanner সর্বপ্রথম মানবদেহের এসব পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর নামানুসারে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোকে Tanner stages (টেনার দশা) বলা হয়।

বয়ঃসন্ধিতে হরমোনের ভূমিকা (Role of Hormone in Puberty)

বয়ঃপ্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণে পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ অংশ থেকে ক্ষরিত দুধরনের গোনাডোট্রফিক হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শৈশবে এ হরমোনগুলোর ক্ষরণ কম থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষরণের মাত্রা বেড়ে যায়, ফলে জননাঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সেকেন্ডারি বা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এভাবে বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে।

ছেলেদের বয়ঃসন্ধিতে হরমোনের ভূমিকা

যে সব হরমোন ছেলেদের বয়ঃসন্ধিতে সাহায্য করে নিচে তার উল্লেখ করা হলো:

১. **সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির গোনাডোট্রফিক হরমোন :** তিন ধরনের গোনাডোট্রফিক হরমোনের মধ্যে দুটি হরমোন পুরুষে জননাঙ্গ ও আনুষঙ্গিক জননাঙ্গগুলোর পূর্ণতা দানে সাহায্য করে।

i. **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) :** সেমিনিফেরাস নালিকার বৃদ্ধি ও পূর্ণতা ঘটিয়ে শুক্রাণু উৎপাদনে সাহায্য করে।

ii. **লুটিনাইজিং হরমোন (LH) :** শুক্রাশয়ের লেডিগ কোষগুলোকে উদ্দীপ্ত করে টেস্টোস্টেরন নামক পুরুষ যৌন হরমোন ক্ষরণে অংশ নেয়।

২. **সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির বিপাকীয় হরমোন এবং পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থির ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন :** দৈহিক চরিত্রের পার্থক্য গঠনে সহায়তা করে।

৩. **অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির অ্যান্ড্রোজেন হরমোন :** শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় লোম বৃদ্ধি, মানসিক ও যৌন চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

৪. **শুক্রাশয়ের টেস্টোস্টেরন হরমোন :** বয়ঃসন্ধিকালে হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎপন্ন যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক রিলিজিং ফ্যাক্টর সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থিকে FSH ও LH ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। এ হরমোনদুটি শুক্রাশয়কে টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে। এ ক্ষরণ বয়ঃসন্ধির মুহূর্তে ক্রমশ বাড়তে শুরু করে এবং বয়ঃসন্ধিকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষরিত হয়। টেস্টোস্টেরন আজীবন ক্ষরিত হলেও বৃদ্ধ বয়সে ধীরে ধীরে কমে যায়।

টেস্টোস্টেরন প্রাইমারি বা মুখ্য জননাঙ্গের বৃদ্ধি, আনুষঙ্গিক জননাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন সেকেন্ডারি বা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

মেয়েদের বয়ঃসন্ধিতে হরমোনের ভূমিকা

যে সব হরমোন মেয়েদের বয়ঃসন্ধিতে সাহায্য করে নিচে তার উল্লেখ করা হলো :

১. **সম্মুখ পিটুইটারির গোনাডোট্রফিক হরমোন :** তিন ধরনের গোনাডোট্রফিক হরমোনের মধ্যে দুটি হরমোন নারীর জননাঙ্গ ও আনুষঙ্গিক জননাঙ্গগুলোর পূর্ণতা লাভে সাহায্য করে।

CamScanner

i. **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) :** ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলকে প্রভাবিত করে রজঃচক্র শুরু করতে সাহায্য করে।

ii. **লুটিনাইজিং হরমোন (LH) :** ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়াম সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে এবং তা থেকে প্রোজেস্টেরন নামক স্ত্রী যৌন হরমোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে।

২. **সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির গ্রোথ হরমোন (GH) :** পেশির বৃদ্ধি ও শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির বিপাকীয় হরমোন এবং পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থির ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন :** দৈহিক চরিত্রের পার্থক্য গঠনে সহায়তা করে।

৪. **অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির ইস্ট্রোজেন হরমোন :** যৌন গ্রন্থি এবং জননাঙ্গের বৃদ্ধি ও পরিণতিতে এবং আনুষঙ্গিক সেকেন্ডারি (গৌণ) যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে কিছুটা সাহায্য করে।

৫. **ডিম্বাশয়ের ইস্ট্রোজেন হরমোন :** বয়ঃসন্ধির শুরুতে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি-নিঃসৃত গোনাডোট্রফিক হরমোনের প্রভাবে ডিম্বাশয় সক্রিয় হয়ে ইস্ট্রোজেন ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

ইস্ট্রোজেন প্রধানত নির্দিষ্ট টিস্যুকোষের সংখ্যা বাড়ায় এবং দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে প্রাইমারি (মুখ্য) জননাঙ্গ, আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ এবং সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ লাভে সহায়তা করে।

ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

নিচে ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করা হলো।

ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ

১. মুখমন্ডলে দাঁড়ি-গোফ এবং বগল ও শ্রোণিদেশে লোম গজায়।
২. দ্রুত ওজন ও উচ্চতা বাড়ে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
৩. তেলগ্রন্থির অধিক নিঃসরণের কারণে মুখমন্ডল চকচকে দেখায় এবং ব্রণ (acne) বিকশিত হতে দেখা যায়।
৪. সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে।
৫. মুখ, ঘাড় ও পেটে চর্বি সঞ্চিত হয়।
৬. পেশি বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়।
৭. স্বরথলির বৃদ্ধি ও ভোকাল কর্ডের (vocal cord) পরিবর্তনের কারণে কণ্ঠস্বর ভারী ও গভীর হয়।
৮. জননাঙ্গের সেমিনাল ভেসিকল, প্রোস্টেট গ্রন্থি ও কাওপার-এর গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে এবং এদের নিঃসরণ শুরু হয়; সেমিনাল ফ্লুইডে ফ্রুক্টোজের আবির্ভাব ঘটে।
৯. লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায়।
১০. শুক্রাশয়ের হরমোন ক্ষরণ এবং শুক্রাশয় থেকে বীর্যপাত ঘটে, স্বপ্নদোষ হয়।

মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ

১. স্তন বিকশিত, বড় ও উন্নত হতে শুরু করে যা মেয়েদের দেহের প্রথম পরিবর্তন; একে থেলারচি (thelarche) বলে।
২. চামড়া তেলতেলে হয়।
৩. সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে।
৪. দ্রুত উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
৫. বগল ও শ্রোণিদেশে (পিউবিক) লোম গজাতে শুরু করে; একে পিউবারচি (pubarche) বলে।
৬. মুখমন্ডল, নিতম্ব ও স্তনসহ সারাদেহে চর্বি সঞ্চিত হয়ে দেহবর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং দেহে নারীসুলভ কমনীয়তা আসে।

CamScanner

৭. ডিম্বাশয়, জরায়ু, যোনি, ক্লাইটোরিস ইত্যাদি জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।
৮. রজঃচক্র শুরু হয়; প্রথম রজঃচক্রকে **মেনারচি** (menarchi) বলে।
৯. ল্যারিংক্সের (স্বরযন্ত্র) আংশিক বৃদ্ধির কারণে মেয়েলি স্বর প্রকাশ পায়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ

১. যৌনতা সম্পর্কে কৌতূহল জাগে, যৌন বিষয়ক চিন্তা করার প্রবণতা বাড়ে।
২. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।
৩. লজ্জাবোধ, আত্মসচেতনতা ও আবেগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
৪. মানসিক অস্থিরতা, চাঞ্চল্যভাব, ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তন, আত্মকেন্দ্রিকতা, উদাস ভাব ইত্যাদি অবস্থা দেখা দেয়।
৫. কেউ কেউ একাকী থাকতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, আবার কেউ কেউ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ পছন্দ করে।
৬. রূপ-চর্চা, সাজগোজ ইত্যাদির ব্যাপারে আগ্রহ জন্মে।
৭. মনে বিচিত্র ভাব ও খেয়াল জেগে উঠে।
৮. স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার ভাবনা আসে।
৯. নিজেকে পূর্ণবয়স্ক ভাবতে শুরু করে।
১০. বয়স্কদের অনুকরণ করতে পছন্দ করে।

২. রজঃচক্র (Menstrual Cycle; ল্যাটিন *mensis* = month)

বয়ঃসন্ধির পর থেকে অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্তির পর থেকে নারীদের জননাঙ্গে যে নিয়মিত পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে স্ত্রীযৌনচক্র বলে। যৌনচক্র প্রজননের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। গর্ভধারণকালীন সময়ে এ চক্র সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন স্ত্রীযৌনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষদের কোনো যৌনচক্র থাকে না। যৌনচক্রের সময় স্ত্রীজননতন্ত্রের সকল অঙ্গেই কোনো না কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে ডিম্বাশয় ও জরায়ুর পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। **যৌনচক্রের সময় ডিম্বাশয়ের পরিবর্তনকে ডিম্বাশয় চক্র** (ovarian cycle) **এবং জরায়ুর প্রাচীর ও এন্ডোমেট্রিয়ামের পরিবর্তনকে জরায়ু চক্র** (uterine cycle) **বলে**। প্রতিবার জরায়ু চক্র শেষে রক্তসহ মিউকাস ও অন্যান্য পদার্থ যোনি পথে বের হয়ে যায়। একে **রজঃস্রাব** (menstruation) বা **রক্তস্রাব** (mense) বলে।

স্ত্রীলোকের সমগ্র যৌন জীবনকালে প্রতি ২৮ দিন (২৪-৩২ দিন) অন্তর ৩–৫ দিন ধরে জরায়ুর অন্তঃস্থ স্তর বা এন্ডোমেট্রিয়ামের অবক্ষয়ের ফলে রজঃস্রাব এবং পরে দেহের অন্যান্য জননাঙ্গসমূহের যেমন–ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদির যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে তাকে রজঃচক্র বলে। প্রথম রজচক্রকে **মেনার্কি** (menarche) এবং যৌন জীবনকালের শেষে রজঃচক্রের নিবৃত্তি বা বন্ধ হওয়াকে **মেনোপজ** (menopause) বলে।

রজঃচক্রের প্রধান কারণ হলো

১. প্রাপ্ত বয়স্ক যৌনক্ষমতা সম্পন্ন নারীর দেহে গর্ভসঞ্চারের অক্ষমতা।
২. প্রতিমাসে ডিম্বনালিতে পরিণত ডিম্বাণুটি এসে নির্দিষ্ট সময় ধরে অবস্থান করে।
৩. ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নারীর সাথে পুরুষের যৌন মিলন হলে **গর্ভসঞ্চার** ঘটে।
৪. গর্ভসঞ্চার না ঘটলে ডিম্বাণুটি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং রজঃস্রাবের সাথে ঝরে পড়ে।
৫. সেজন্য রজঃচক্রকে সন্তান ধারণে অক্ষমতার জন্য **জরায়ুর কান্না** (uterine cry) বলে অভিহিত করা হয়।

রজঃচক্রের প্রক্রিয়া (Process of Menstrual Cycle)

প্রায় ৮০% নারী রজঃচক্র শুরুর ১/২ সপ্তাহ আগে থেকেই কিছু উপসর্গ বুঝতে পারে। সাধারণ উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ব্রণ ওঠা, স্তন স্পর্শকাতর ও স্ফীত হওয়া, পরিশ্রান্ত, খিটখিটে ও অস্থির মেজাজ ইত্যাদি। এসব উপসর্গ দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাই এগুলোকে **প্রাক রজঃচক্রীয় উপসর্গ** (premenstrual syndrome) বলে। সাধারণত

CamScanner

২০-৩০% নারী এ উপসর্গে ভুগে থাকে, ৩-৮% নারীর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা প্রচণ্ডরূপে অনুভূত হয়। রজঃচক্রের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দুটি চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, একটি **ডিম্বাশয় চক্র**, অন্যটি **জরায়ু চক্র**। উভয় চক্রই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সুনির্দিষ্ট চক্রীয় ক্ষরণে নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিম্বাশয় চক্র **ফলিকুলার ও লুটিয়াল** পর্যায় এবং জরায়ু চক্র রজঃস্রাবীয়, বৃদ্ধিশীল ও **ক্ষরণশীল** পর্যায় নিয়ে গঠিত।

রজঃচক্র

ডিম্বাশয় চক্র
১. ফলিকুলার পর্যায়
২. লুটিয়াল পর্যায়

জরায়ু চক্র
১. রজঃস্রাবীয় পর্যায়
২. বর্ধনশীল পর্যায়
৩. ক্ষরণশীল পর্যায়

রজঃচক্র একটি জটিল জৈবনিক প্রক্রিয়া যা হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রক্রিয়াটির বিশদ বিবরণ না দিয়ে নিচে সংক্ষেপে এর বর্ণনা দেয়া হলো।

মানুষের রজঃচক্রকে নিচে বর্ণিত ৩টি ধাপে ভাগ করা হয়।

ক. রজঃস্রাবীয় পর্যায় (The menstrual phase) : রজঃস্রাব এ পর্যায়ের **প্রারম্ভ নির্দেশ করে**। যখন ডিম্বাশয় হতে বিমুক্ত ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ ও জরায়ু প্রাচীরে রোপনে ব্যর্থ হয় তখন কর্পাস লুটিয়াম ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে **ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদন বন্ধ হয়**। ফলে জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীরের রক্তজালক ফেটে যায় এবং ডিম্বাণু, মিউকাস ও রক্তসহ এন্ডোমেট্রিয়াম ভেঙ্গে গিয়ে যোনিপথে বের হয়ে আসে।

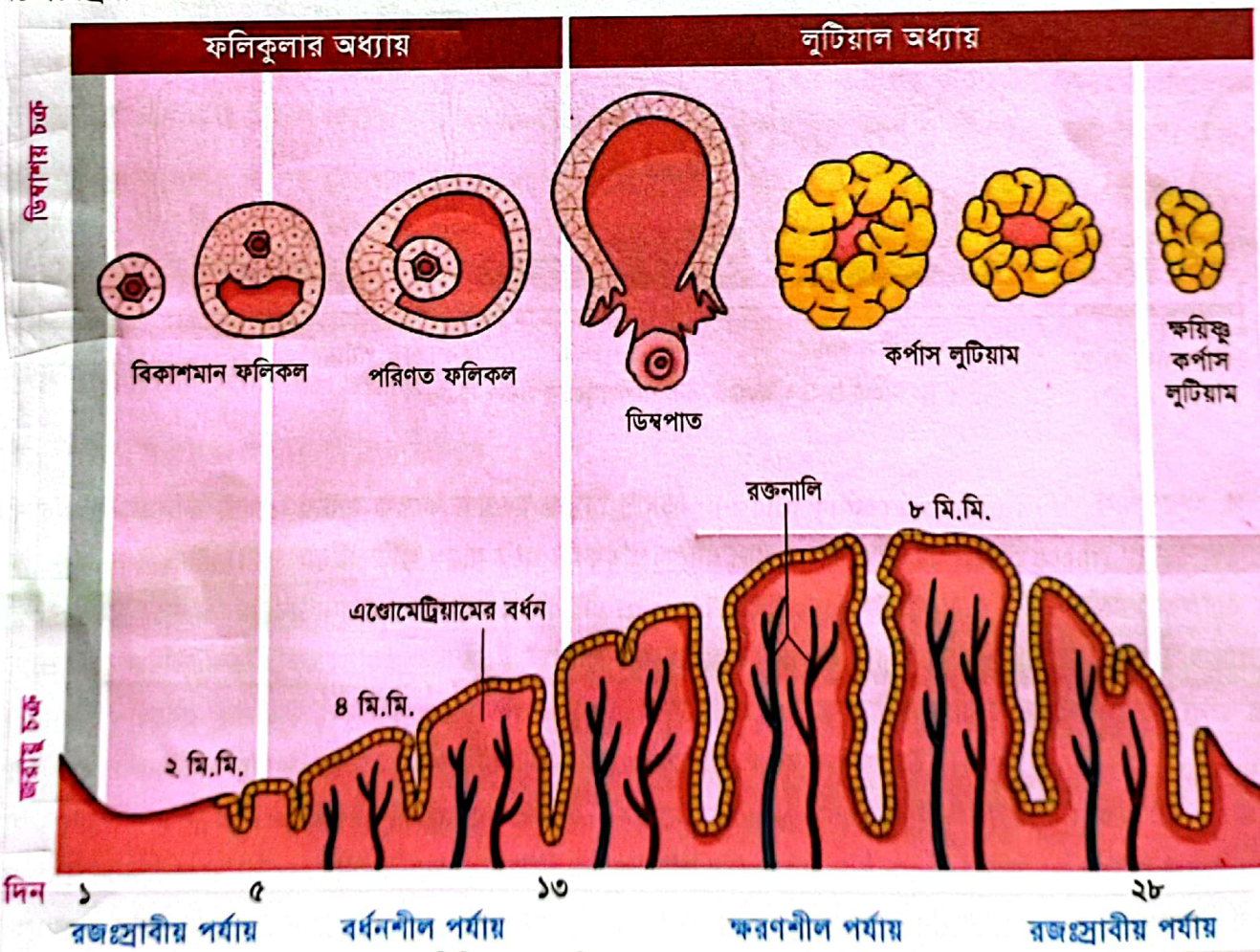

চিত্র ৯.৫ : রজঃচক্রের বিভিন্ন দশায় ডিম্বাশয় ও জরায়ুর মধ্যে পরিবর্তন সমূহের চিত্ররূপ

CamScanner

খ. বর্ধনশীল পর্যায় (The proliferative phase) : রজঃস্রাবীয় পর্যায়ের শেষে জরায়ু মিউকোসার কেবল ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া (lamina propria) এবং গ্রন্থিসমূহের মূল অংশ অবশিষ্ট থাকে। যখন ডিম্বাশয়ে ফলিকল বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা চলতে থাকে, তখন জরায়ু প্রাচীর বর্ধনশীল পর্যায় অতিক্রম করে। গ্রাফিয়ান ফলিকলে ডিম্বাণু বৃদ্ধির পাশাপাশি **ইস্ট্রোজেন হরমোন** তৈরি হয়। ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম স্তরের দ্রুত পুনর্গঠন শুরু হয়। ফলে এর পুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে জরায়ুর অন্তঃপ্রাচীর নিষিক্ত ডিম্বাণু ধারণের উপযোগী হয়। দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ দিনে রক্তে ইস্ট্রোজেন এর মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। ইস্ট্রোজেন এর প্রভাবে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে **লুটিনাইজিং হরমোন** (Luteinizing hormone-LH) নিঃসৃত হয়। লুটিনাইজিং হরমোনের প্রভাবে চতুর্দশ দিনে গ্রাফিয়ান ফলিকল (graafian follicle) থেকে ডিম্বাণু মুক্ত হয়ে ডিম্বনালির মাধ্যমে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ডিম্বাণুর নিঃসরণ বা নিষ্ক্রমণকে **ডিম্বপাত বা ওভ্যুলেশন** (ovulation) বলে।

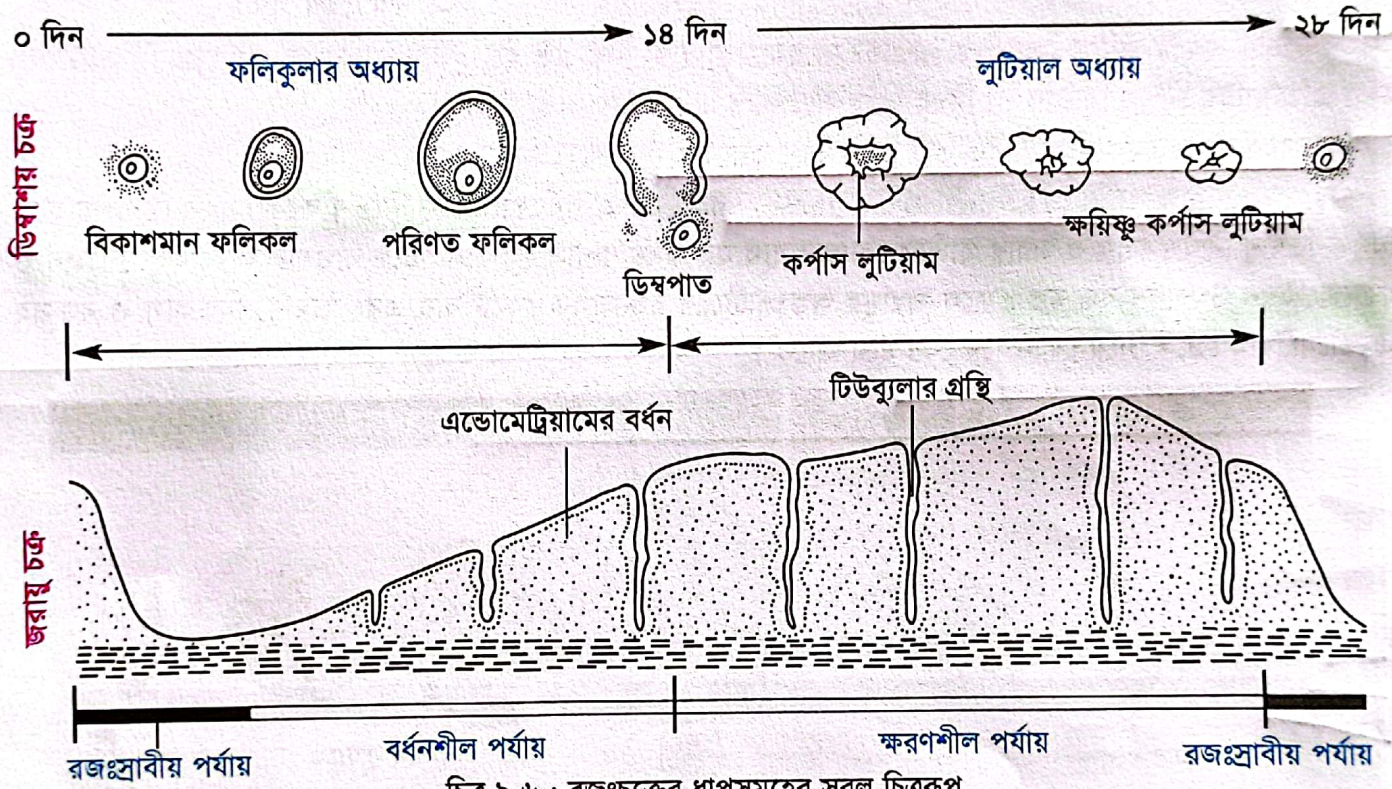

চিত্র ৯.৬ : রজঃচক্রের ধাপসমূহের সরল চিত্ররূপ

গ. ক্ষরণশীল পর্যায় (The secretory phase) : ডিম্বাণু বিমুক্ত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ফলিকলের অবশিষ্ট থিকা কোষগুলো (theca cells) তে দ্রুত ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যাকে **লুটিনাইজেশন** (luteinization) বলে। ফলে গ্রাফিয়ান ফলিকল **কর্পাস লুটিয়াম** (corpus luteum) এ পরিবর্তিত হয়। হলুদ বর্ণ ধারণ করে বলে কর্পাস লুটিয়ামকে **ইয়েলো বডি** (yellow body)-ও বলা হয়। কর্পাস লুটিয়াম ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন তৈরি করে। ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রোজেস্টেরন জরায়ু প্রাচীরকে উপযোগী করে এবং একই সাথে ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (Follicle Stimulating Hormone, FSH) উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। ডিম্বাণু নিষিক্ত হলে ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে প্রথিত হয়। পরবর্তীতে সৃষ্ট **অমরা** (প্লাসেন্টা) ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন তৈরির মাধ্যমে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিবেশ বজায় রাখে। ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে ১০–১২ দিন পর কর্পাস লুটিয়াম নষ্ট হয়ে যায় ফলে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদন বন্ধ হয়। ফলস্বরূপ জরায়ু প্রাচীরের এন্ডোমেট্রিয়ামের রক্তজালক ফেটে গিয়ে পরবর্তী চক্রের রজঃস্রাব পর্যায় শুরু হয়।

CamScanner

রজঃচক্রের তাৎপর্য (Significance of Menstrual Cycle)

১. রজঃচক্র মেয়েদের যৌন জীবনকালের সূচনা করে।
২. এটি স্ত্রীলোকের প্রজনন সক্ষমতা নির্দেশ করে।
৩. রজঃচক্র স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদন সক্ষমতা নির্দেশ করে এবং প্রতিমাসে একবার গর্ভধারণের সুযোগ সৃষ্টি করে।
৪. রজঃচক্র ডিম্বাণু উৎপাদন, ডিম্বথলির পরিপক্কতা, ডিম্বপাত, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন, ভ্রূণ সৃষ্টি এবং জরায়ুকে ভ্রূণ ধারণ ও পোষণের উপযোগী করার সুযোগ সৃষ্টি করে।
৫. নিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের যৌন সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ।
৬. অনিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের যৌন অসুস্থতা প্রকাশ করে।

ঋতুচক্র (Oestrus cycle)

অপ্রাইমেট (non primates) জাতীয় স্ত্রী স্তন্যপায়ী সদস্যে (যেমন-কুকুর, বিড়াল, ছাগল ইত্যাদি) রজঃচক্রের পরিবর্তে **ঋতুচক্র** হতে দেখা যায়। প্রজনন ঋতুতে যৌনজননে সক্ষম অপ্রাইমেট জাতীয় স্ত্রীপ্রাণীর জননাঙ্গে সংঘটিত পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের চক্রীয় ধারাকে **ঋতুচক্র** বলে। ঋতুচক্র কেবলমাত্র **প্রজনন ঋতুতে** (breeding season) সংঘটিত হয়। স্ত্রীপ্রাণী কেবলমাত্র এ সময়কালেই যৌনজননে সক্রিয় হয় এবং যৌন মিলনে অংশ নেয়। রজঃচক্রের মতো ঋতুচক্রের শেষে রজঃস্রাব ঘটে না। এর পরিবর্তে ডিম্বাণু নিঃসরণের সময় খুবই সামান্য পরিমাণে রক্তক্ষরণ ঘটে, তবে তা বাইরে আসে না।

৩. গ্যামেট সৃষ্টি (Formation of Gametes) বা গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis)

যেসব প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে সেসব ক্ষেত্রে **নিষেক**-এর পর **পরিস্ফুটন** শুরু হয়। নিষেকের জন্য একটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু অত্যাবশ্যক যা একটি প্রজাতির পরিণত বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী সদস্য সৃষ্টি করতে সক্ষম।

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গের (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়) প্রাইমর্ডিয়াল জননকোষ (জনন মাতৃকোষ) থেকে গ্যামেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) উৎপন্ন হয়ে নিষেকে সক্ষম হয়ে উঠে তাকে গ্যামেটোজেনেসিস (গ্রিক *gamos* = জননকোষ এবং *genesis* = সৃষ্টি হওয়া) **বলে**। শুক্রাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস** এবং ডিম্বাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস** বলা হয়।

নিচে স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উওজেনেসিসের বিভিন্ন ধাপের সচিত্র বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস

পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস (spermatogenesis; গ্রিক *sperma* = শুক্রাণু + *genesis* = জনন বা সৃষ্টি হওয়া) **বলে**। পুরুষ জননাঙ্গে অর্থাৎ শুক্রাশয়ে এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। শুক্রাশয় অসংখ্য **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules)-য় গঠিত। এসব নালিকার প্রাচীর **জার্মিনাল এপিথেলিয়াম** (germinal epithellium) নামক আবরণী কোষে আবৃত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এপিথেলিয়ামের প্রতিটি কোষ শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম। তবে সব কোষ স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। যেসব কোষ এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে শুক্রাণু গঠন করে সেগুলোকে **প্রাইমর্ডিয়াল জননকোষ** (primordial germ cell) **বা জনন মাতৃকোষ বলে**। অবশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে জার্মিনাল কোষগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেহকোষও দেখা যায়। **এগুলোকে সারটলি কোষ** (sertoli cell) বলে যা বৃদ্ধিশীল শুক্রাণুর পুষ্টি সরবরাহ করে।

CamScanner

নিচে মানুষের স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা যায়।

i. **সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase) :** শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যেসব কোষ থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাদের **প্রাইমোর্ডিয়াল জননকোষ বা জনন মাতৃকোষ** (2n) বলে। এগুলো পুনঃপুনঃ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন কোষগুলোকে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia, একবচনে- spermatogonium) বলে। এরা ডিপ্লয়েড (2n) ধরনের কোষ।

ii. **পরিবর্ধন পর্যায় (Growth phase) :** প্রত্যেক স্পার্মাটোগোনিয়াম সেমিনিফেরাস নালিকার **সারটলি কোষ** থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বড় হয়। এ কোষগুলোকে **প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট** (primary spermatocyte) বলে। এসব কোষের নিউক্লিয়াস আয়তনে বেশ বড় এবং ক্রোমোজোমগুলোতে মিয়োসিসের ইন্টারফেজ দশার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation phase) :** এ পর্যায়ের শুরুতে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটগুলোতে প্রথম মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, ফলে সৃষ্ট কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এদের **সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** (secondary spermatocyte) বলে। এগুলোর প্রতিটি দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি করে **স্পার্মাটিড** (spermatid) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়।

iv. **স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis) :** যে জটিল প্রক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম, গোলাকার স্পার্মাটিড ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, আর কোন বিভাজন ছাড়াই সচল শুক্রাণুতে পরিণত হয় তাকে **স্পার্মিওজেনেসিস** বলে। প্রথমে স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসটি পানি, RNA ও নিউক্লিয়াস পরিত্যাগ করে সঙ্কুচিত হয় এবং শুক্রাণুর মাথা গঠন করে। স্পার্মাটিডের গলজি বডি থেকে **অ্যাক্রোসোম** (acrosome) সৃষ্টি হয়ে শুক্রাণুর মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে। স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিওল শুক্রাণুর অক্ষীয় সূত্রক ও লেজ গঠন করে। এভাবে স্পার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে সচল, লম্বাকৃতির ও প্রায় সাইটোপ্লাজমবিহীন শুক্রাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে।

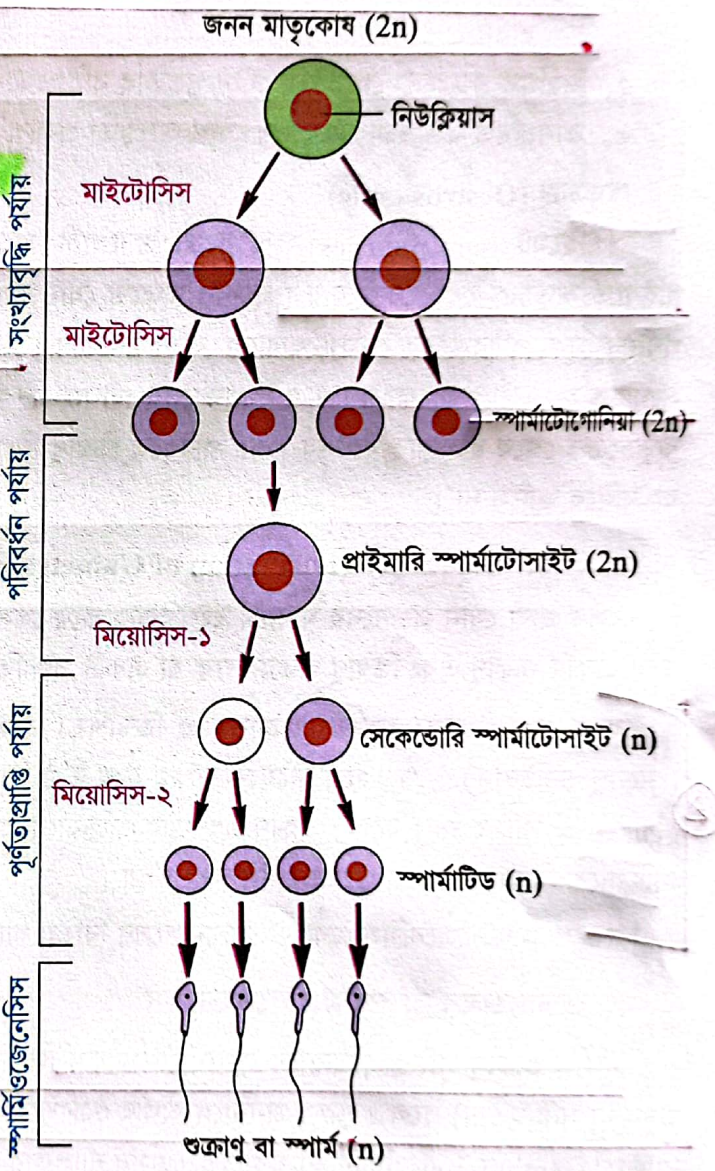

চিত্র ৯.৭ : স্পার্মাটোজেনেসিসের ধাপসমূহ

মানুষের শুক্রাণুর গঠন (Structure of Human Sperm)

বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর আকার ও আকৃতিতে তারতম্য দেখা যায়। শুক্রাণুর আকৃতি প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific)। প্রায় সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণু আণুবীক্ষণিক (তবে কিছু কিছু ব্যাঙ ও ড্রসোফিলা মাছির শুক্রাণু দৈর্ঘ্যে ২ মি.মি. এর অধিক পর্যন্ত হয় এবং খালি চোখে দেখা যায়)। সাধারণত এরা সরু, দীর্ঘাকার ও লম্বা লেজবিশিষ্ট।

CamScanner

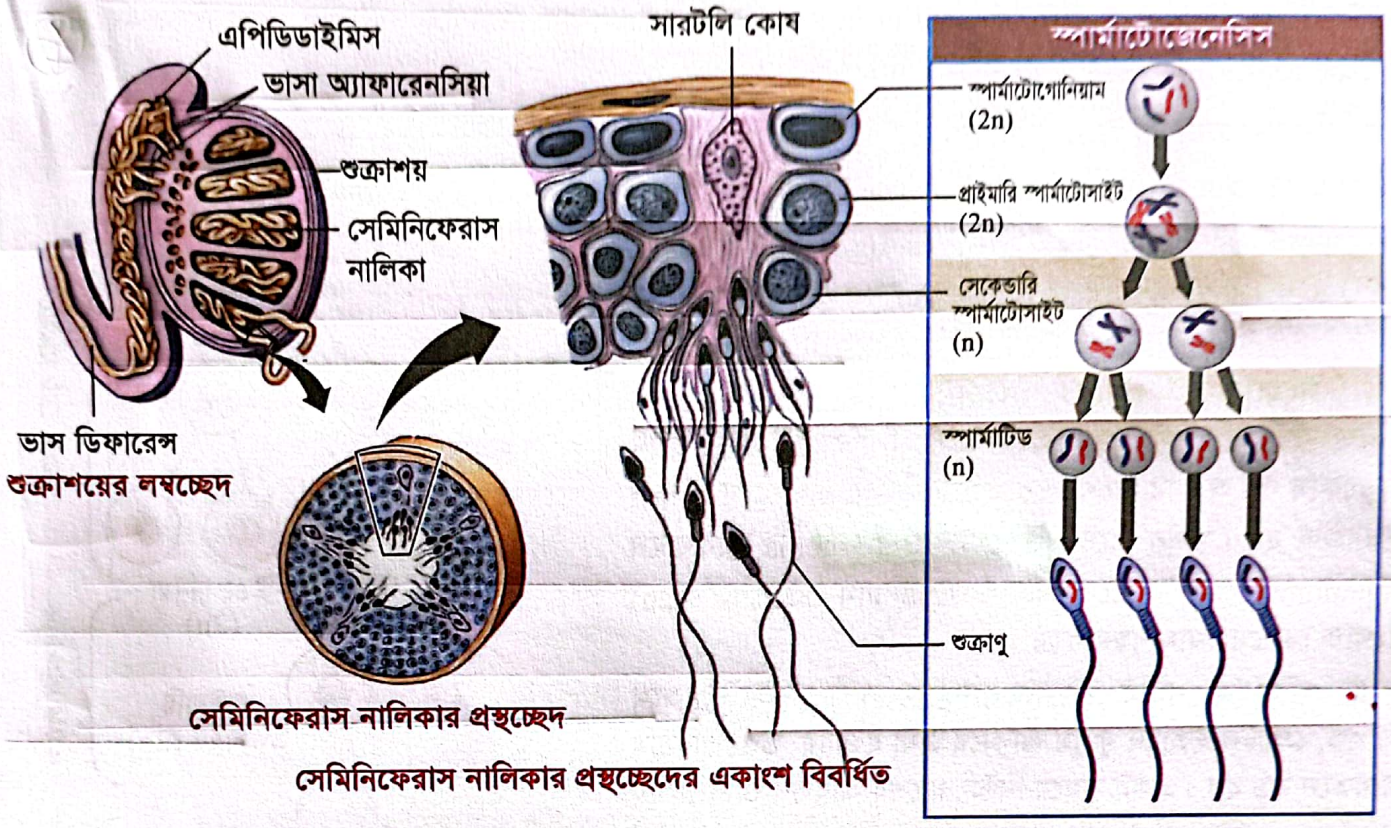

চিত্র ৯.৮ : শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ হলো শুক্রাণু। মানুষের শক্রাণুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০–৭০ মাইক্রোমিটার এবং ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটার। এদের দেহ নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে গঠিত।

i. **মাথা (Head) :** মাথা হচ্ছে শুক্রাণুর সামনের অংশ যা দেখতে স্ফীতকায়, কোণাকার বা লেন্সের মত। শুক্রাণুর সম্পূর্ণ মাথা একটি পাতলা সাইটোপ্লাজমীয় স্তরে আবৃত থাকে। মাথার সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশ জুড়ে থাকে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস। এতে ক্রোমোজোম (n সংখ্যক) থাকায় পিতার বংশগতি সন্তানে সঞ্চারিত হয়। এর সামনের অর্ধেক অংশের উপরে নিউক্লিয়াসকে ঢেকে থাকে অ্যাক্রোসোম। অ্যাক্রোসোম একটি থলি বিশেষ। অ্যাক্রোসোমে উপস্থিত টিস্যু গলনকারী এনজাইম ডিম্বাণুর ঝিল্লি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করে।

ii. **গ্রীবা (Neck) :** গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাথার ঠিক পিছনে মাথা ও মধ্যখন্ডের মাঝখানে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ, স্বচ্ছ সংযোগস্থল। এখানে পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি সেন্ট্রিওল থাকে।

iii. **মধ্য খন্ড (Middle piece) :** সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া ও অক্ষীয় সূত্রে গঠিত অংশটি হচ্ছে শুক্রাণুর মধ্য খন্ড। এর মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার অংশই বেশি। মাইটোকন্ড্রিয়া ফ্ল্যাজেলাম সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

iv. **লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম (Tail or Flagellum) :** শুক্রাণুর মধ্যখণ্ডের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার সমাপ্তির অংশ থেকে শুরু করে পিছনের সবটুকুই লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম। এটি শুক্রাণুর দীর্ঘতম অংশ। এতে অক্ষীয় সূত্রের এক অংশ একটি স্থূল আবরণে আবৃত থাকে, বাকি অংশ থাকে অনাবৃত। এদের যথাক্রমে

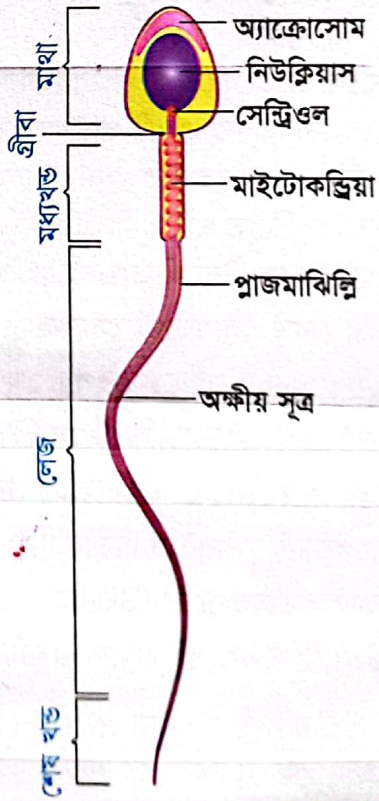

চিত্র ৯.৯ : মানুষের শুক্রাণু গঠন

CamScanner

মূলখন্ড (main piece) ও **শেষখন্ড** (end piece) বলা হয়। ফ্ল্যাজেলাম শুক্রাণুকে গতিশীল করে নিষেকের উদ্দেশে ডিম্বাণুর কাছে পৌছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস

ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির পদ্ধতিকে উওজেনেসিস (oogonesis; গ্রিক *oon* =ডিম্বাণু + *genesis* = সৃষ্টি হওয়া বা জনন) **বলে**। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা হয়।

i. **সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase) :** উওজেনেসিসের জন্য জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের কিছু **জনন মাতৃকোষ** বড় আকার ধারণ করে মাইটোসিসের মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ বিভাজিত হয়। তখন এদের **উওগোনিয়া** (oogonia, একবচনে oogonium) বলে। প্রত্যেকটি উওগোনিয়াম ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে।

ii. **পরিবর্ধন পর্যায় (Growth phase) :** সাইটোপ্লাজমে লিপিড, প্রোটিন ইত্যাদি কুসুম আকারে জমা হওয়ায় উওগোনিয়াম আয়তনে বড় হয়। একই সময়ে নিউক্লিয়াসের আয়তন ও বিপাকীয় কাজসহ প্রোটিন সংশ্লেষণ অনেক বৃদ্ধি পায়। পরিবর্ধিত এ উওগোনিয়ামকে **প্রাইমারি উওসাইট** (primary oocyte) বলে। প্রতিটি প্রাইমারি উওসাইট (2n) একস্তর গ্রানুলোসা বা **ফলিকল কোষ** (granulosa or follicle cells)-এ আবৃত হয়ে **প্রাইমারি ফলিকল** (primary follicle)-এ পরিণত হয়।

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation phase) :** বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এর মধ্যে সাধারণত একটি পরিণত হয়, অন্যগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিণত প্রাইমারি ফলিকলকে **গ্রাফিয়ান ফলিকল** (graafian follicle) বলে। বৃদ্ধিরত প্রাইমারি ফলিকলের অভ্যন্তরস্থ **প্রাইমারি উওসাইট** প্রথম **মিয়োটিক বিভাজন**-এর মাধ্যমে দুটি অসম কোষ উৎপন্ন করে। বড় কোষটিকে **সেকেন্ডারি উওসাইট** (secondary oocyte, n) এবং ছোট কোষটিকে **১ম পোলার বডি** (1st polar body) বলে। এরপর ১ম পোলার বডি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **দুটি পোলার বডি** সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সেকেন্ডারি উওসাইটটি নিষেকের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সেকেন্ডারি উওসাইট অবস্থায় ডিম্বপাত বা **ওভুলেশন** (ovulation) ঘটে। নিষেকের সময় কোন শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা ভেদ করতে পারলে তখন সেকেন্ডারি উওসাইটে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন সম্পন্ন হয়। এ বিভাজনে সেকেন্ডারি উওসাইটটি অসমভাবে বিভক্ত হয়ে একটি বড় **হ্যাপ্লয়েড উওটিড** (ootid) ও একটি ছোট **পোলার বডি** (n) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি বড় উওটিড ও তিনটি ছোট পোলার বডি সৃষ্টি হয়।

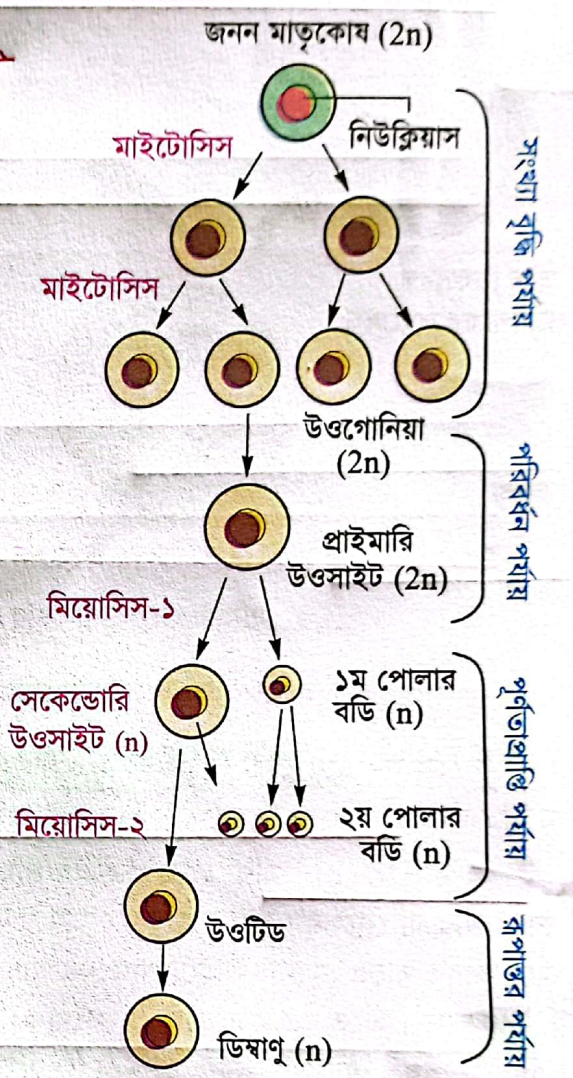

চিত্র ৯.১০ : উওজেনেসিসের ধাপসমূহ

iv. **রূপান্তর পর্যায় (Metamorphosis phase) :** এ পর্যায়ে উওটিড রূপান্তরিত হয়ে কার্যকর **ওভাম** (ovum) বা ডিম্বাণু-তে পরিণত হয়। তবে শুক্রাণুর মতো এক্ষেত্রে আকৃতি ও আকারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল নিষেকের প্রস্তুতি লাভের জন্য এর ভিতরের পদার্থের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। সকল পোলার বডি বিনষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়।

CamScanner

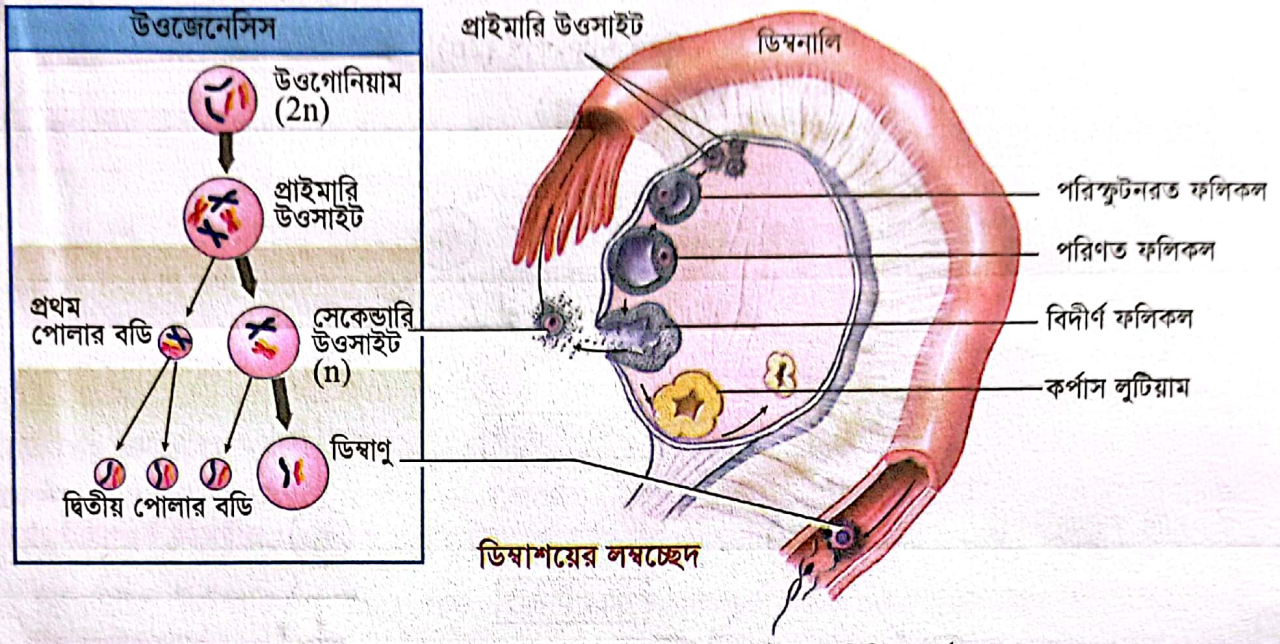

চিত্র ৯.১১ : ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে উওজেনেসিস-এর বিভিন্ন পর্যায়

মানুষের ডিম্বাণুর গঠন (Structure of Human Ovum or Egg)

স্ত্রী জননকোষের নাম **ডিম্বাণু**। এটি অনেকটা গোল এবং ১০৪–১২০ মাইক্রোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভিতর **উওসাইট** (oocyte) বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পরিণত ডিম্বাণুতে রূপ নেয়। প্রতিটি পরিপক্ক ডিম্বাণুকে নিচে বর্ণিত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়।

i. **ডিম্বাণু ঝিল্লি (Egg membrane) :** ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম্বাণুর নির্গমন ঘটে তা সম্পূর্ণ পরিণত ডিম্বাণু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি **সেকেন্ডারি উওসাইট** যা আরেক দফা বিভাজনের মাধ্যমে (দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন) দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি ও ত্যাগ করে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ডিম্বাণু গ্লাইকোপ্রোটিন সমৃদ্ধ জোনা **পেলুসিডা** (zona pellucida) নামক একটি প্রাইমারি আবরণে দৃঢ়ভাবে আবৃত থাকে। পরবর্তী সময়ে চারদিকে জোনা পেলুসিডা ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যবর্তী অংশ তরলে পূর্ণ জায়গায় পরিবৃত হয়। এ জায়গাটিকে **পেরিভাইটেলাইন ফাঁক** (perivitelline space) বলে। প্রথম পোলার বডিকে এ ফাঁকা স্থানে দেখা যায়। জোনা পেলুসিডাকে বেষ্টন করে বিকীর্ণ রশ্মির মতো ফলিকুলার কোষের স্তর থাকে। ফলিকুলার কোষ নির্মিত এ আবরণকে **করোনা রেডিয়েটা** (corona radiata) বলে। এটি নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত ডিম্বাণুকে রক্ষা করে এবং নিষেকের সময় অ্যাক্রোসোমাল এনজাইমের প্রভাবে কোষগুলো খসে পড়ে।

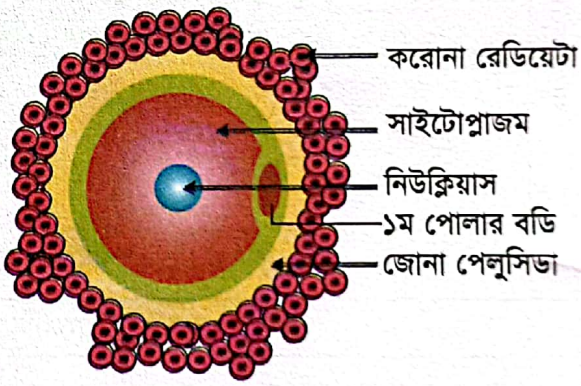

চিত্র ৯.১২ : মানুষের ডিম্বাণু

ii. **সাইটোপ্লাজম বা উওপ্লাজম (Ooplasm) :** ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম **উওপ্লাজম** নামে পরিচিত। এতে প্রচুর গলজি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও কর্টিক্যাল গ্র্যানিউল (cortical granule) থাকে। মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অতিসামান্য এবং সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে। তাই মানুষের ডিম্বাণুকে **মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু** (microlecithal egg) বলে।

iii. **নিউক্লিয়াস (Nucleus) :** ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস বেশ বড়, কেন্দ্র থেকে একটু সরে অবস্থান করলেও নিষেকের সময় কেন্দ্রে চলে আসে। নিউক্লিয়াসে প্রচুর RNA ও ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে।

CamScanner

স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিস এর মধ্যে তুলনামূলক চিত্র

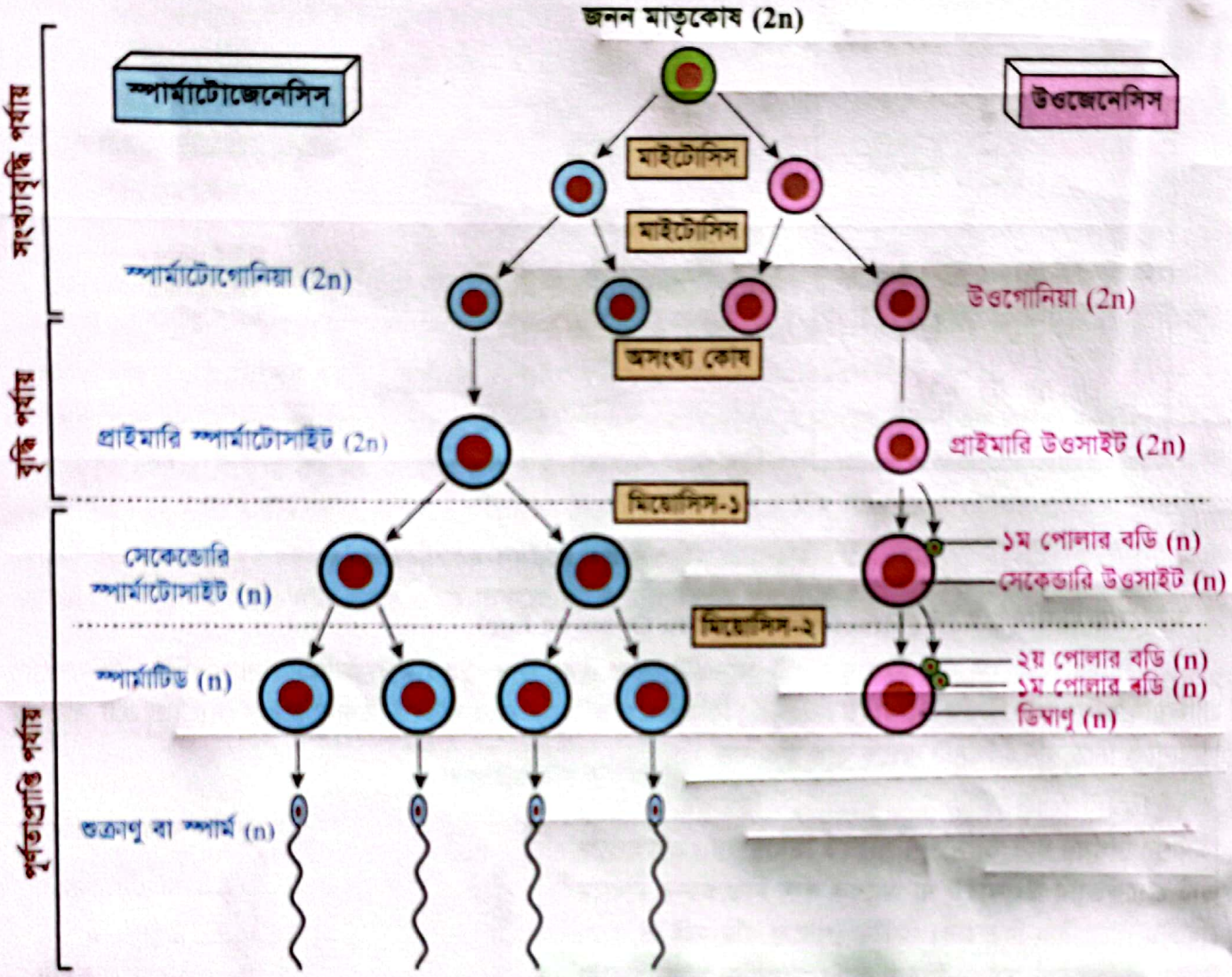

চিত্র ৯.১৩ : স্পার্মাটোজেনেসিস (বামে) ও উওজেনেসিস (ডানে)

স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য

স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis)	উওজেনেসিস (Oogenesis)
১. শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।	১. ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে।
২. সমগ্র প্রক্রিয়াটি শুক্রাশয়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।	২. প্রক্রিয়াটির প্রাথমিক পর্যায় ডিম্বাশয়ে সম্পন্ন হলেও শেষ পর্যায় ডিম্বাশয়ের বাইরে ডিম্বনালিতে ঘটে।
৩. একটি শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে চারটি শুক্রাণু সৃষ্টি হয়।	৩. একটি ডিম্বাণু মাতৃকোষ থেকে একটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।
৪. কোন পোলার বডি সৃষ্টি হয় না।	৪. তিনটি পোলার বডি সৃষ্টি হয়।
৫. শুক্রাণু কুসুমবিহীন এবং সচল।	৫. ডিম্বাণু কুসুমযুক্ত এবং নিশ্চল।
৬. এটি বয়ঃসন্ধিকালে শুরু হয় এবং সুস্থ পুরুষদেহে সারাজীবন (৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত রেকর্ড আছে) অব্যাহত থাকে।	৬. এটি ভ্রূণাবস্থায় শুরু হয় এবং মেনোপজ অর্থাৎ ৪৫–৫০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ্যামেটোজেনেসিস এর তাৎপর্য : (i) যৌনজননে অংশগ্রহণকারী জীব গ্যামেটোজেনেসিসের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখে। গ্যামেটোজেনেসিস ছাড়া জিনগত ভারসাম্যযুক্ত অপত্য জীব সৃষ্টি সম্ভব নয়। (ii) গ্যামেটোজেনেসিসের সময় মিয়োসিস বিভাজন সংঘটিত হয়। এ সময় ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জিনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জননকোষ উৎপন্ন হয়, ফলে জীবজগতে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে। (iii) উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিমাসে সাধারণত একটি নিশ্চল ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন কোটি কোটি সচল শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। ফলে নিষেক ঘটার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় এবং প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। (iv) ডিম্বাণুতে সঞ্চিত কুসুম নিষেক পরবর্তী ভ্রূণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়।

৪. নিষেক (Fertilization)

পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেক বলে। এ প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে তাদের হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোমবাহী নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটিয়ে ডিপ্লয়েড (2n) ক্রোমোজোমবাহী **জাইগোট** গঠন করে। মানুষের নিষেক **অন্তঃনিষেক** ধরনের এবং তা সাধারণত ফেলোপিয়ান নালি বা ডিম্বনালির উর্ধ্বাংশে সংঘটিত হয়।

দৈহিক মিলন বা সঙ্গমের সময় পুরুষ সঙ্গীটি স্ত্রীলোকের যোনিদেশের উর্ধ্বাংশে বীর্যপাত ঘটায়। প্রতিবার সঙ্গমে ১.৫–৪ মিলিলিটার বীর্য ক্ষরিত হয় এবং এতে প্রায় ৪–১০ কোটি শুক্রাণু থাকে। শুক্রাণু ক্ষরণের পর এদের নিষিক্তকরণ ক্ষমতা ১২–২৪ ঘন্টা বজায় থাকে, যদিও শুক্রাণুগুলো স্ত্রীযৌনাঙ্গের ভিতর ৩ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। অন্যদিকে, ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণুর নিষিক্ত হওয়ার ক্ষমতা ২৪–৩৬ ঘণ্টা (আধুনিক ধারণা মতে ৬–৭ ঘন্টা) বজায় থাকে, যদিও ডিম্বনালিতে ডিম্বাণুটি ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। সাধারণত রজঃচক্রের মাঝামাঝি সময় নিষেকের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।

মানবদেহে যে নিষেক ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে **সেকেন্ডারি উওসাইট ও পরিণত শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের একীভবন**। এ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ।

i. স্খলিত শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম থেকে **হায়ালিউরোনিডেজ** (hyaluronidase) নামক হাইড্রোলাইটিক এনজাইম ক্ষরিত হয়। ডিম্বাণুর চারদিকে অবস্থিত ফলিকল কোষগুলো যে সব পদার্থের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে সে সব পদার্থকে এ এনজাইম বিগলিত করে শুক্রাণুর গমন পথ সৃষ্টির সূচনা করে।

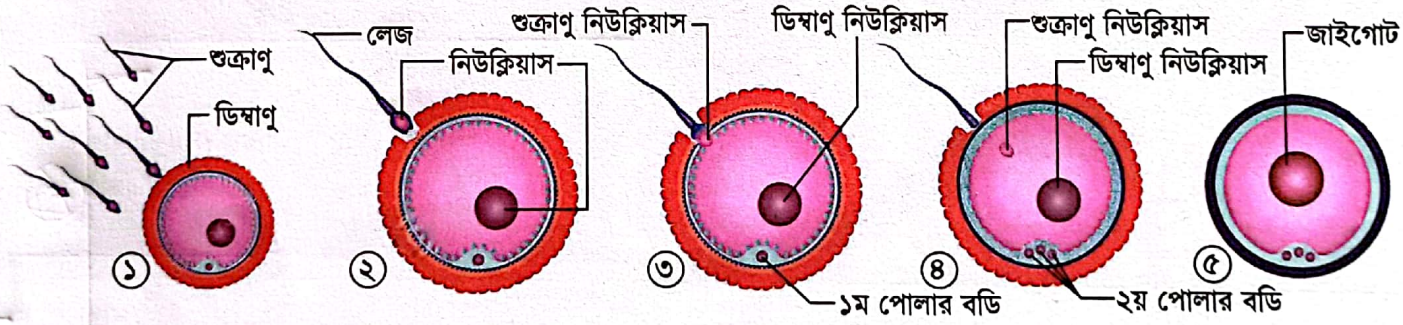

চিত্র ৯.১৪ : নিষেক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক পর্যায়

ii. গমন পথ ধরে শুক্রাণুর লেজের সাহায্যে চালিত হয়ে ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডার বহির্দেশে পৌঁছে (সেকেন্ডারি উওসাইটের চতুর্দিক ঘিরে অবস্থিত পুরু স্তরকে জোনা পেলুসিডা বলে)। এ স্তরে অবস্থিত বিশেষ সংগ্রাহক প্রোটিনে শুক্রাণুর মস্তক-ঝিল্লির সংগ্রাহকগুলো বন্ধনের সৃষ্টি করে।

iii. বন্ধনের ফলে উদ্দীপ্ত হয়ে শুক্রাণু-মস্তক আরেক ধরনের এনজাইম ক্ষরণ করে। এ এনজাইম জোনা পেলুসিডার অংশকে হজম করে একটি পথের সৃষ্টি করে। এ পথ ধরে শুক্রাণু ডিম্বাণু-ঝিল্লির বহির্তলে এসে পৌঁছায়। এর মস্তকটি ডিম্বাণুর ভিলাই-সমৃদ্ধ প্লাজমামেমব্রেনের সাথে একীভূত হয় এবং ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে।

CamScanner

iv. শুক্রাণু-মস্তক ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের সাথে সাথে ডিম্বাণুর বহির্দেশে অবস্থিত কর্টিকাল দানা (cortical granules) নামে পরিচিত লাইসোজোমগুলো এনজাইম ক্ষরণ করে। এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা পুরু ও শক্ত হয়ে **নিষেক ঝিল্লি** (fertilization membrance) নির্মাণ করে। ফলে আর কোনো শুক্রাণু নিষেকে অংশ নিতে পারে না। তাছাড়া, এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডার শুক্রাণু-গ্রাহক প্রোটিনগুলোও নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কোনো শুক্রাণুই আর জোনা পেলুসিডায় যুক্ত হতে পারে না।

v. শুক্রাণু প্রবেশের ফলে সেকেন্ডারি উওসাইটটি উদ্দীপ্ত হয়ে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন (মিয়োসিস-২) ঘটিয়ে পরিণত ডিম্বাণু ও দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পোলার বডি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং শুক্রাণু-লেজ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মিশে যায়। শুক্রাণু-নিউক্লিয়াসে তখন ক্রোমাটিনগুলো ঢিলে-ঢালা হয়ে পড়ে, ফলে নিউক্লিয়াসটি স্ফীত হয়। এ পর্যায়ের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসকে যথাক্রমে **পুরুষ ও স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াই** (male and female pronuclei) বলে।

vi. পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হলে ডিম্বাণুটি ডিপ্লয়েড জাইগোট ($n + n = 2n$)-এ পরিণত হয়।

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য

(i) নিষেক পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে; (ii) নিষেকের ফলে জাইগোটে জিনের নতুন সমন্বয় এবং এতে প্রকরণের সূচনা ঘটে; (iii) নিষেকের ফলে ডিম্বাণু পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়; (iv) নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড সংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; (v) নিষেক ডিম্বাণুর বিপাক হার ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে; (vi) নিষেকের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়; (vii) নিষেক জীবের বংশ রক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।

৫. ইমপ্ল্যান্টেশন (Implantation)

নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে (স্তন্যপায়ী প্রাণীর জরায়ুর অন্তর্গাত্রে অবস্থিত রক্তবাহিকা ও গ্রন্থিসমৃদ্ধ স্থূল মিউকাসঝিল্লি) সংস্থাপিত হয় তাকে **ইমপ্ল্যান্টেশন বলে**। ডিম্বাণু ডিম্বনালির (ফেলোপিয়ান নালি) উর্ধ্বপ্রান্তে নিষিক্ত হয়ে জাইগোটে পরিণত হয়। এটি দ্রুত

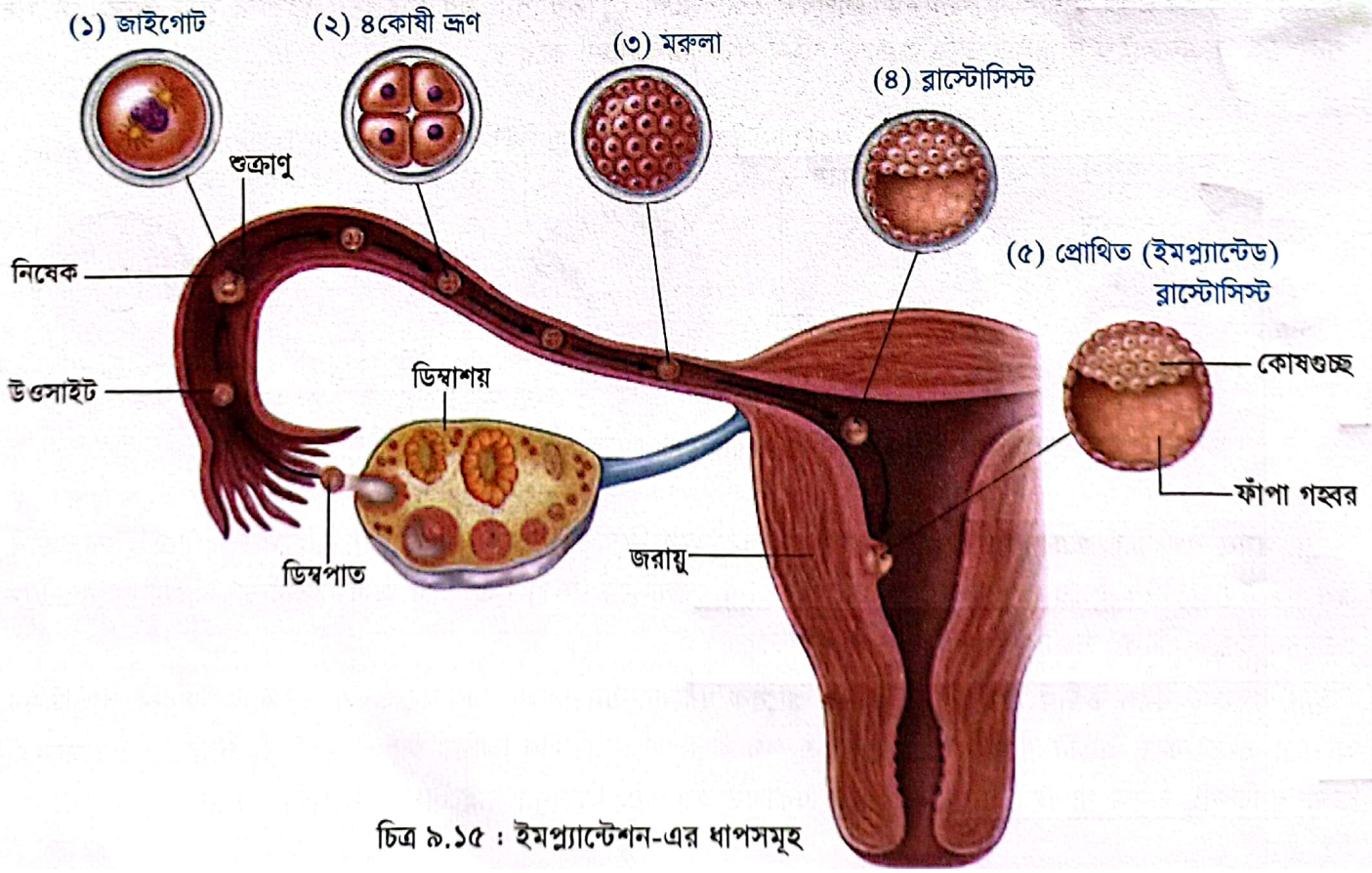

চিত্র ৯.১৫ : ইমপ্ল্যান্টেশন-এর ধাপসমূহ

CamScanner

বিভক্ত হয়ে **মরুলা** (morula) নামক একটি নিরেট কোষপুঞ্জের সৃষ্টি করে এবং ডিম্বনালির সিলীয় আন্দোলন ও ক্রমসঙ্কোচনের ফলে নিম্নগামী হয়। জাইগোটের পর্যায়ক্রমিক মাইটোসিস বিভাজনকে ক্লিভেজ (cleavage) বলে। নিরেট কোষপুঞ্জটি ডিম্বনালি থেকে সংগৃহীত তরলে পূর্ণ অন্তঃস্থ গহ্বর (ব্লাস্টোসিল) সমন্বিত ও এককোষস্তরীয় ব্লাস্টোসিস্ট (blastocyst)-এ পরিণত হয়। ব্লাস্টোসিস্টে প্রায় ১০০টির মতো কোষ থাকে। প্রতিটি কোষকে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) বলে। ব্লাস্টোমিয়ারের স্তরকে বলে **ট্রফোব্লাস্ট** (trophoblast)। ৪-৫ দিনের ভিতর ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে পৌঁছালে দুদিনের মধ্যে এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ট্রফোব্লাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্ড্রোমেট্রিয়াম (ভিতরের প্রাচীর) কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে প্রোথিত হবে সেখানকার আবরণী টিস্যু ট্রফোব্লাস্ট থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হয়। তখন ব্লাস্টোসিস্টটি সেখানে যুক্ত হয়। এভাবে নিষেকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে আবদ্ধ হয়। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের প্রোথিত হওয়ার এ প্রক্রিয়ার নামই **ইমপ্ল্যান্টেশন**।

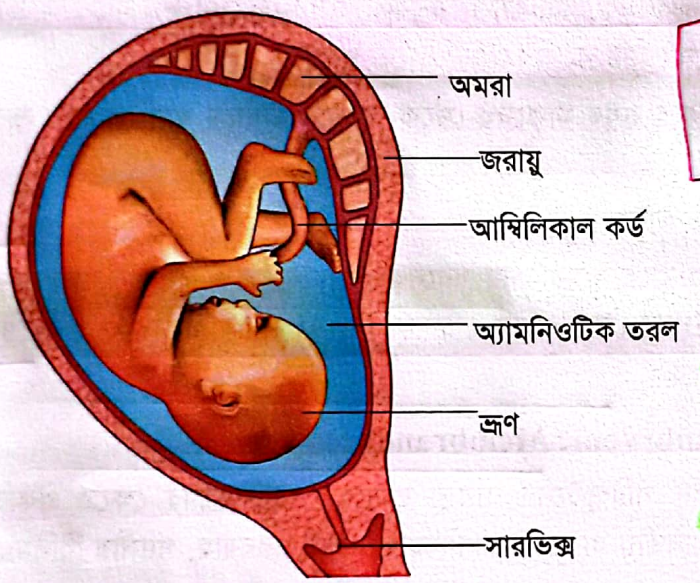

চিত্র ৯.১৬ : অমরা

অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta)

ভ্রূণীয় ও মাতৃটিস্যুতে গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অমরা বা প্লাসেন্টা বলে। এটি কোরিওন-এর একটি অংশ যার মাধ্যমে ফিটাস ও মায়ের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পরে প্লাসেন্টা গঠিত হয় [৮ সপ্তাহ পর ভ্রূণ যখন প্রায় মানুষের অবয়ব লাভ করে তখন তাকে **ফিটাস** (fetus) বলে]।

অমরায় ফিটাসের অংশ হচ্ছে **কোরিওনিক কোষ** (chorionic cell)। কোষগুলো **কোরিওনিক ভিলাই** (chorionic villi) সৃষ্টি করে। আম্বিলিকাল ধমনি ও শিরা নামক দুটি রক্তবাহিকা এসব ভিলাইয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কৈশিকজালিকা নির্মাণ করে। প্রধান রক্তবাহিকাদুটি **নাভীরজ্জু** বা **আম্বিলিকাল কর্ড** (umbilical cord) নামক ৪০-৫০ সেমি. লম্বা একটি শক্ত গড়নের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে। অ্যামনিওন ও কোরিওন উদ্ভূত কোষে কর্ডটি বেষ্টিত থাকে।

অমরায় মাতৃদেহের অংশ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রবর্ধনসমূহ। এসব প্রবর্ধন ও কোরিওনিক ভিলাইয়ের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে আর্টারিওল (সূক্ষ্ম ধমনি) থেকে আগত ধমনি-রক্তে পূর্ণ স্থান। এসব স্থান দিয়ে জরায়ু-প্রাচীরে রক্ত আর্টারিওল থেকে ভেনিউলে (সূক্ষ্ম শিরা) প্রবাহিত হয়।

অমরা চাকতি আকৃতির, বেশ বড় গঠন। পূর্ণ গঠিত অমরার ওজন প্রায় ৬০০ গ্রাম, ব্যাস ১৫–২০ সেমি. এবং মাঝখানে ৩ সেমি. পুরু।

অমরার মাধ্যমে ফিটাস ও মাতৃদেহের মধ্যে যে সকল বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে তা নিম্নরূপ -

মাতা থেকে ফিটাস	ফিটাস থেকে মাতা
অক্সিজেন, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, লিপিড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, আয়ন (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, Fe^{2+}), অ্যালকোহল, নিকোটিন এবং অনেক ঔষধ, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি।	কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ।

CamScanner

অমরার কাজ

১. সংস্থাপন : অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ু-প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে।

২. পুষ্টি : অমরা মায়ের রক্তস্রোত থেকে ভ্রূণের দেহে পুষ্টিদ্রব্য (মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, প্রোটিন ও ছোট ছোট লিপিড অণু) সরবরাহ করে।

৩. গ্যাসীয় বিনিময় : অমরা মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে।

৪. রেচন : ভ্রূণের বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ অমরার মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হয়ে মায়ের দেহে প্রবেশ করে।

৫. অনাক্রম্যতা : মাতৃদেহের রক্তে কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে যেমন ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির জন্য উৎপন্ন অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে ঐসব রোগের বিরুদ্ধে ভ্রূণকে অনাক্রম্য করে তোলে।

৬. জীবাণু বহন : কয়েক ধরনের ভাইরাসকে অমরা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণে প্রবেশ করতে দিয়ে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। [গর্ভকালীন সময়ে মা যদি সিফিলিস, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, রুবেলা এসব রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।]

৭. ওষুধ সেবন : চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ মাতৃদেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ব্যাপিত হয়ে ভ্রূণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

৮. সঞ্চয় : অমরায় স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও লৌহ সঞ্চিত থাকে।

৯. হরমোন নিঃসরণ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে অমরা চার ধরনের হরমোন ক্ষরণ করে (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন ও হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন) জরায়ু-প্রাচীর ও স্তনগ্রন্থির গড়নে ও কাজে এবং প্রসব ঝামেলামুক্ত করণে সাহায্য করে।

ভ্রূণ আবরণী (Embryonic Membrane)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা রয়েছে। মানবভ্রূণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সবচেয়ে বেশী যত্নবান হয়ে ভ্রূণের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পুষ্টি সরবরাহ, গ্যাসীয় বিনিময়, রেচন পদার্থ ত্যাগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়াই যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তার জন্য ভ্রূণের চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো ঝিল্লি। এসব ঝিল্লির উৎপত্তি সর্বপ্রথম সরিসৃপে ঘটলেও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে।

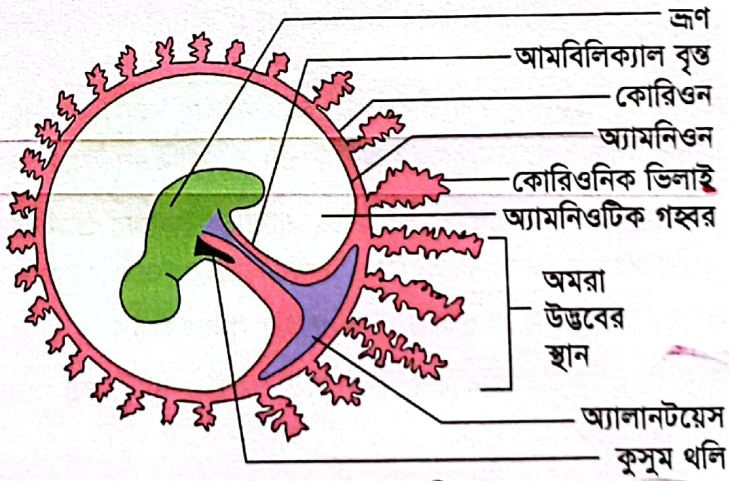

চিত্র ৯.১৭ : ভ্রূণ আবরণী

পরিস্ফুটনকালে মানবভ্রূণ যে ৪টি ঝিল্লিতে বেষ্টিত থাকে সে এগুলোকে **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী** (extra embryonic membrane) বলে। কারণ আবরণীগুলো ভ্রূণের আনুষঙ্গিক গঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভ্রূণদেহের চতুর্দিক ঘিরে রাখে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়। প্রাণিজগতের সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীতে যে ভ্রূণসংশ্লিষ্ট আবরণী রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বহিঃভ্রূণীয় আবরণী।

মানবভ্রূণে চারটি বহিঃভ্রূণীয় আবরণী রয়েছে, যথা–ক. অ্যামনিওন, খ. অ্যালানটয়েস, গ. কোরিওন ও ঘ. কুসুম থলি। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

CamScanner

ক. অ্যামনিওন (Amnion) : ভ্রূণের এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মের অংশগ্রহণে গঠিত যে থলি আকৃতির আবরণ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থেকে ভ্রূণকে ঘিরে রাখে, তাকে **অ্যামনিওন** বলে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।

কাজ : (i) ভ্রূণকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। (ii) ঝাঁকুনিজনিত আঘাত থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করে। (iii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে। (iv) তরলে পূর্ণ হওয়ায় বাইরের চাপ ভ্রূণদেহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

খ. অ্যালানটয়েস (Allantois) : ভ্রূণীয় অন্ত্রের পশ্চাৎ অংশে মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মে গঠিত থলির মতো যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়ে কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত হয়, তাকে **অ্যালানটয়েস** বলে। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। অ্যালানটয়েস বাইরের দিকে বর্ধিত ও কোরিওনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ **অ্যালানটো-কোরিওন** (allanto-chorion) সৃষ্টি করে।

কাজ : (i) ভ্রূণের শ্বসনে সাহায্য করে। (ii) ভ্রূণের রেচনে সাহায্য করে। (iii) অ্যালানটো-কোরিওন অমরা গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

গ. কোরিওন (Chorion) : ভ্রূণের সর্ববহিঃস্থ আবরণ যা এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত হয়, তাকে **কোরিওন** বলে।

কাজ: (i) অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্বসনে ও পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে।
(ii) অমরা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

ঘ. কুসুম থলি (Yolk sac) : ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট থলি আকৃতির তরলে পূর্ণ ঝিল্লিকে **কুসুম থলি** বলে। মানবভ্রূণের পুষ্টি কুসুম নির্ভর না হলেও সরিসৃপ, পাখি প্রভৃতির প্রচুর কুসুমযুক্ত ডিমে ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় যে ধরনের কুসুম থলি সৃষ্টি হয়, মানবভ্রূণেও তেমনটি হয়।

কাজ : কুসুম থলি **স্টেমকোষ** (stem cell)-এর উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব কোষ থেকে রক্তকণিকা ও লিম্ফয়েড কোষ উৎপন্ন হয়। স্টেম কোষগুলো পরবর্তীতে বর্ধনশীল ভ্রূণে প্রবেশ করে। তাই কুসুম থলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝিল্লি।

৬. মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Development of the Human Embryo)

নিষেকের পর জাইগোট (2n) **যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে পরিস্ফুটন বলে।** প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে **ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন** (ontogenic development) বলা হয়। যে শাখায় জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়, তাকে **ভ্রূণবিদ্যা** (embryology) বলে। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **এমব্রায়োজেনেসিস** (embryogenesis)। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিম্নরূপ।

❐ **ক্লিভেজ (Cleavage) :** যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা **সম্ভেদ** বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে বলে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere)। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলকে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা** (morula)। মরুলার কোষগুলো ক্রমশ একস্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভিতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এ দশাকে **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে। ভ্রূণ ব্লাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

❐ **গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrulation) :** ভ্রূণে **আর্কেন্টেরন** (archenteron) নামক প্রাথমিক খাদ্যগহ্বর বা আন্ত্রিকগহ্বর সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **গ্যাস্ট্রুলেশন** বলে। পরিস্ফুটনের এ ধাপে ব্লাস্টোডার্ম দুই বা তিনটি কোষস্তর গঠন করে। এদের বলে **ভ্রূণীয় স্তর** (germinal layers)। এসব স্তর থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠিত হয়। এ পর্যায়ে ভ্রূণীয় স্তরগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে একটি অংশ ব্লাস্টোডার্মের পিঠেই রয়ে যায়। পরবর্তীতে একে **এক্টোডার্ম** নামে অভিহিত করা হয়। অন্য অংশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **মেসোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম**-এ পরিণত হয়। কোষ

CamScanner

পরিযানের (migration) কারণেই এসব হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়া শেষ হলে ভ্রূণ যে রূপ ধারণ করে তাকে গ্যাস্ট্রুলা (gastrula) বলে। এর ভিতরে যে গহ্বর থাকে তাকে আর্কেন্টেরন (archenteron), আর গহ্বরটি যে ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত থাকে, তাকে ব্লাস্টোপোর (blastopore) বলে।

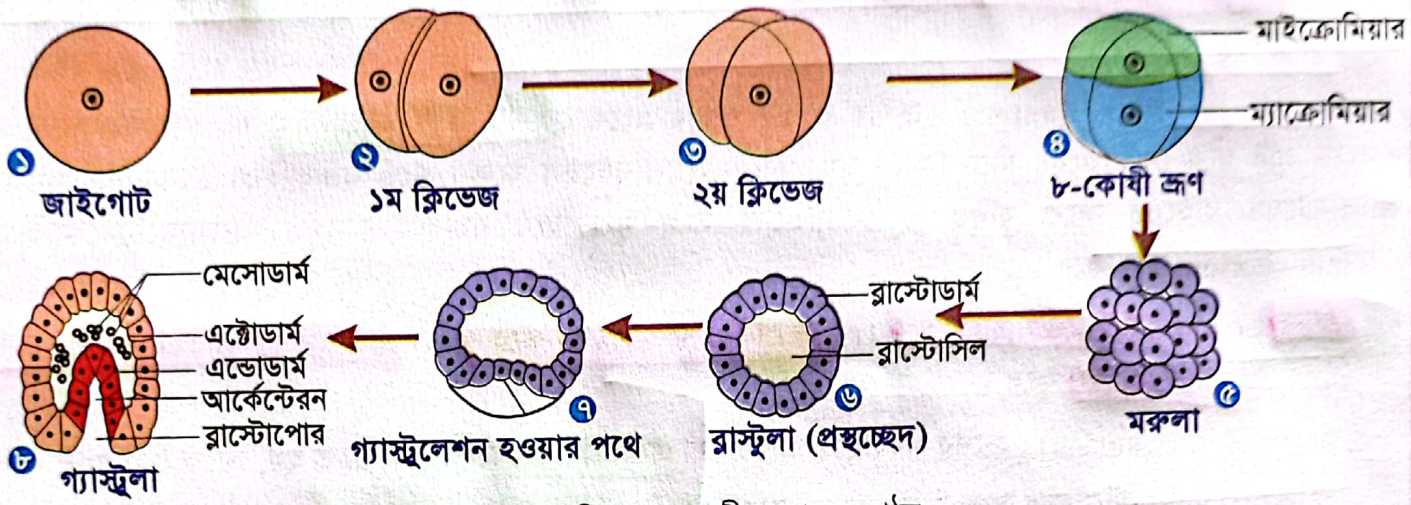

চিত্র ৯.১৮ : ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় কোষস্তর গঠন

❐ **অর্গানোজেনেসিস (Organogenesis) :** গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট ভ্রূণীয় স্তরগুলো থেকে **ভ্রূণের অঙ্গকুঁড়ি** (organ rudiment) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অর্গানোজেনেসিস** বলে। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরেরই অভিন্ন কোষপিন্ড ছোটো ছোটো কোষগুচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রত্যেক গুচ্ছ প্রাণিদেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ বা অংশ নির্মাণ করে। এসব কোষগুচ্ছকে একেকটি অঙ্গের **কুঁড়ি** বলে। যে সব কুঁড়িতে ভ্রূণীয় স্তরগুলোর উপবিভক্তি ঘটে সেগুলোকে **প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি** বলে। এদের কয়েকটি বেশ জটিল এবং এমন কতকগুলো কোষ নিয়ে গঠিত যারা একটি সম্পূর্ণ অঙ্গতন্ত্র গঠনেও সক্ষম। যেমন–সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র কিংবা পৌষ্টিকতন্ত্র ইত্যাদি। প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি আরও বিভক্ত হয়ে **সেকেন্ডারি অঙ্গকুঁড়ি**–তে পরিণত হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of Three Germ Layers)

ত্রিস্তরী প্রাণিদের ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় গ্যাস্ট্রুলায় এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক যে তিনটি পৃথক কোষস্তর তৈরি হয় তাদের জার্ম স্তর (germ layers) **বা ভ্রূণীয় স্তর বলে**। এ তিনটি ভ্রূণীয় স্তর থেকে বর্ধনশীল ভ্রূণে বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো:

১. **এক্টোডার্মের পরিণতি:** গ্যাস্ট্রুলার একেবারে বাইরের কোষস্তরের নাম **এক্টোডার্ম**। এটি ভ্রূণ পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অংশে বিভেদিত হয়, যথা-**সোমাটিক এক্টোডার্ম, নিউরাল নালি এবং নিউরাল ক্রেস্ট**। সোমাটিক এক্টোডার্ম থেকে পরে ত্বকের এপিডার্মিস; ত্বকোদ্ভূত গ্রন্থি, চুল ও নখ; চক্ষু ও তার লেন্স, কর্নিয়া ও আইরিশ; মধ্য পিটুইটারি, নাকের এপিথেলিয়াম, ঠোঁট ও মুখবিবরের আবরণ, জিহ্বার আবরণ, পায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণ, কর্ণকুহরের আবরণ; অন্তঃকর্ণ, লালাগ্রন্থি, দাঁতের এনামেল ইত্যাদি উৎপত্তি হয়। নিউরাল নালি

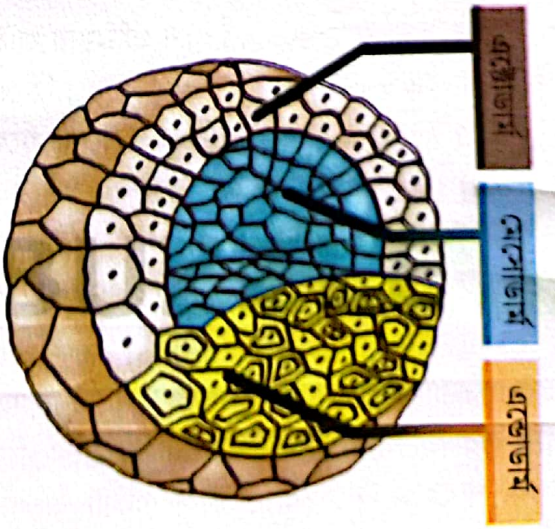

চিত্র ৯.১৯ : তিনটি ভ্রূণীয় স্তর

CamScanner

থেকে সুষুম্নাকাণ্ড, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, পশ্চাৎপিটুইটারি, চোখের রেটিনা ইত্যাদি উদ্ভব হয়। নিউরাল ক্রেস্ট থেকে স্নায়ুগ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল মেডুলা ইত্যাদি বিকশিত হয়।

২. **মেসোডার্মের পরিণতি :** গ্যাস্ট্রুলার মধ্যস্থ কোষস্তর হলো **মেসোডার্ম**। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি তিনটি অংশে বিভেদিত হয়, যথা-**এপিমিয়ার, মেসোমিয়ার** এবং **হাইপোমিয়ার**। এ তিনটি অংশ থেকে বিকাশমান ভ্রূণে সুনির্দিষ্ট অঙ্গ গঠিত হয়। এপিমিয়ারের কিছু অংশ মেসেনকাইমরূপে ত্বকের ডার্মিস এবং কিছু অংশ মেরুদণ্ডসহ (নটোকর্ড) সমগ্র কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। এপিমিয়ারের বাকী অংশ মায়োটোম গঠন করে যা থেকে কঙ্কালপেশি বিকশিত হয়। মেসোমিয়ার থেকে উৎপন্ন হয় রেচন (বৃক্ক) ও জনন অঙ্গ (শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়) এবং তাদের নালিসমূহ। হাইপোমিয়ার হৃৎপিণ্ড, রক্ত, রক্তবাহিকা, লসিকাতন্ত্র, বৃক্ক, প্লীহা, পেরিটোনিয়াম, মেসেন্টেরিক, ভিসেরাল পেশি ও যোজক টিস্যু গঠন করে। এছাড়া ইউস্টেশিয়ান নালি, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, দাঁতের ডেন্টিন ইত্যাদিও হাইপোমিয়ার থেকে গঠিত হয়।

৩. **এন্ডোডার্মের পরিণতি :** গ্যাস্ট্রুলার অন্তঃস্থ কোষস্তর হলো **এন্ডোডার্ম**। এন্ডোডার্ম থেকে প্রথমে **আদিঅন্ত্র বা আর্কেন্টেরন** গঠিত হয়। আর্কেন্টেরন থেকে পরে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, যেমন–গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। এ সময় গলবিল অঞ্চলে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এর পার্শ্বদেশ থেকে কয়েক জোড়া ক্ষুদ্র থলিকা উদ্ভবের মাধ্যমে গঠিত হয় মধ্যকর্ণ, টনসিল, থাইমাস, থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। গলবিলের অঙ্কীয়দেশের একটি উপবৃদ্ধি থেকে ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া ও ফুসফুসের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া মূত্রথলি, জনন গ্রন্থি, অগ্রপিটুইটারি ইত্যাদিও এন্ডোডার্ম থেকে গঠিত হয়।

নিচে ছক আকারে তিনটি ভ্রূণের পরিণতি দেখানো হলো।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি	
ভ্রূণীয় স্তর	**পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে যে অংশ গঠিত হয়**
এক্টোডার্ম	১. ত্বকের এপিডার্মাল অংশ এবং ত্বকীয় গ্রন্থি, চুল, পালক, নখ, ক্ষুর, এক ধরনের শিং ও আঁইশ। ২. চোখ ও অন্তঃকর্ণ। ৩. পায়ুর আবরণ। ৪. দাঁতের এনামেলসহ মৌখিক গহ্বর। ৫. সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু পেশি।
মেসোডার্ম	১. অধিকাংশ পেশি; মেদটিস্যু ও অন্যান্য যোজক টিস্যু। ২. ডার্মিস, কয়েক ধরনের আঁইশ ও শিং এবং দাঁতের ডেন্টিন। ৩. কঙ্কালতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও লসিকাতন্ত্র। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের অধিকাংশ। ৭. পৌষ্টিকনালির বহিঃস্তর।
এন্ডোডার্ম	১. পৌষ্টিকনালির অন্তঃস্তর। ২. পাকস্থলি ও অন্ত্রের গ্রন্থিসমূহ। ৩. শ্বসনতন্ত্র, থাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়। ৪. মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের কিছু অংশ (কখনও কখনও)।

CamScanner

৭. ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ (Development of Embryo and Fetus)

মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের শিশুকে ভ্রূণ এবং এর পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে ফিটাস বলে। মাতৃগর্ভে শিশু প্রায় ৯ মাস (৩৬-৪০ সপ্তাহ) থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। এসময় যেসব পরিবর্তন ঘটে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১ম সপ্তাহ : নিষেক, ক্লিভেজের ফলে নিষেকের ৪–৫ দিন পর ব্লাস্টোসিস্টের উৎপত্তি। কোষ সংখ্যা ১০০ এর অধিক। ৬-৯ দিন পর ইমপ্ল্যান্টেশন।

২য় সপ্তাহ : এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম গঠন। এ পর্যায়ের পর মানব ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ।

৩য় সপ্তাহ : গর্ভবতীর মাসিক বন্ধ। গর্ভাবস্থায় এটিই প্রথম লক্ষণ। মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না স্নায়ুর উৎপত্তি শুরু। ভ্রূণ ২ মিলিমিটার।

৪র্থ সপ্তাহ : হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, রক্ত এবং অন্ত্রের উৎপত্তি শুরু। আমবিলিক্যাল কর্ড বৃদ্ধিরত। ভ্রূণ ৫ মিলিমিটার।

৫ম সপ্তাহ : মস্তিষ্ক বৃদ্ধিরত। পদকুঁড়ি (limb bud) এর উৎপত্তি যা থেকে হাত এবং পা তৈরি হবে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : চোখ এবং কান গঠনের সূত্রপাত।

৭ম সপ্তাহ : মুখমণ্ডল তৈরি হয়। চোখে রঙ দেখা যায়।

১২তম সপ্তাহ : সকল অঙ্গ, পেশি, হাড়, হাত ও পায়ের আঙ্গুলসহ পরিণত ভ্রূণ। জনন অঙ্গ সুগঠিত।

২০তম সপ্তাহ : ভ্রূ এবং অক্ষিপক্ষ (চোখের পাতার লোম) সহ লোমের উৎপত্তি শুরু। হাতের আঙ্গুলের রেখার বিকাশ।

২৪তম সপ্তাহ : চোখের পাতা খুলতে পারে।

২৬তম সপ্তাহ : অপ্রাপ্তকালে জন্ম হলে বেঁচে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

২৮তম সপ্তাহ : বলিষ্ঠভাবে নড়াচড়ায় সক্ষম। স্পর্শ ও অতিশব্দ অনুভব করে এবং মূত্র ত্যাগ করে।

৩০তম সপ্তাহ : মাথা নিচ দিকে, জন্মের জন্য প্রস্তুত।

৩৮তম সপ্তাহ : সাধারণত ৯ মাসের শিশু জন্মগ্রহণ করে।

চিত্র ৯.২০ : জরায়ুর অভ্যন্তরে বৃদ্ধিরত শিশুর বিভিন্ন ধাপ

শিশু প্রসব (Birth of a Baby)

নিষেকের পর ৯–১০ সপ্তাহের মধ্যে বাহ্যিকভাবে ভ্রূণকে মানুষ হিসেবে শনাক্ত করা যায়। ভ্রূণের এ অবস্থাকে ফিটাস (fetus) বলে। জরায়ুতে ফিটাস প্রায় ৩৮ সপ্তাহ অবস্থান করে। এ সময়কালকে গর্ভধারণকাল (the gestational period) বলে। গর্ভধারণকালের প্রথম ১২ সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে প্রধান অঙ্গসমূহের অধিকাংশ তৈরি হয়ে যায়।

শিশু প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের জন্য ৩৮ সপ্তাহের সাথে ২ সপ্তাহ যোগ করে অর্থাৎ সর্বশেষ রজঃচক্রের প্রথম দিনের সাথে ৪০ সপ্তাহ যোগ করে সম্ভাব্য প্রসব দিন (Expected Date of Delivery, EDD) নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রসব ৫ দিন পূর্বে বা পরে হতে পারে।

CamScanner

মানুষে গর্ভাবস্থা (pregnancy) কাল ৩৮ থেকে ৪০ সপ্তাহ। গর্ভাবস্থায় ১২তম সপ্তাহে অমরা নিঃসৃত প্রোজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে জরায়ুর সঙ্কোচন বন্ধ থাকে। গর্ভাবস্থায় রক্তে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বাড়তে থাকে তবে ৩৮তম সপ্তাহে রক্তে প্রোজেস্টরনের মাত্রা হঠাৎ করেই কমে যায় ফলে জরায়ু সঙ্কোচনের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। একই সাথে মাতার পশ্চাৎপিটুইটারি গ্রন্থি থেকে **অক্সিটোসিন** (oxytocin) এবং প্লাসেন্টা থেকে **প্রোস্টাগ্লান্ডিন** (prostaglandin) হরমোন ক্ষরণ শুরু হয়। ৪০তম সপ্তাহে জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটে। সঙ্কোচনের ফলে শিশু জরায়ু থেকে বাইরে আসতে পারে। এ প্রক্রিয়া তিনটি ধাপে সংঘটিত হয়, যথা–

১. জরায়ু মুখ (cervix) ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
২. ফিটাস জরায়ু থেকে বাইরে আসে এবং
৩. অমরা ও নাভীরজ্জু বা **আমবিলিক্যাল কর্ড** (umbilical cord, ফিটাস থেকে অমরা পর্যন্ত আমবিলিক্যাল ধমনি ও শিরা বনহকারী অঙ্গকে নাভীরজ্জু বলে) জরায়ুর অভ্যন্তর থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

জমজ শিশু (Twin Babies)

কখনো কখনো একসাথে দুটি বা তার বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এদের **জমজ শিশু** বলে। জমজ দুধরনের, যথা– **অভিন্ন ও ভিন্ন**।

❐ **অভিন্ন জমজ (Identical twins)** : একটি জাইগোট ১ম বিভাজনের সময় দুটি পৃথক কোষে পরিণত হলে পরবর্তীতে উক্ত দুটি কোষ থেকে শিশুর জন্ম হয়। এরা একই লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ে হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি এবং চেহারা প্রায় এক রকম হয়।

❐ **ভিন্ন জমজ (Non-identical twins)** : দুটি পৃথক ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে দুটি জাইগোট উৎপন্ন হলে- এ দুটি জাইগোট থেকে দুটি শিশুর জন্ম হয়। এরা একই লিঙ্গের বা ভিন্ন লিঙ্গেরও হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা (Pregnancy & Care During Pregnancy)

গর্ভে সন্তান ধারণকারী মাকে গর্ভবতী (pregnant) **বলা হয়**। গর্ভাবস্থায় মায়ের পরিচর্যায় পালনীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচর্যা

গর্ভাবস্থার শুরুতে মাকে চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানো ও তাঁর পরামর্শমতো চলা দরকার। World Health Organization (WHO) অনুসারে গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৪টি ডাক্তারি ভিজিট জরুরি সেগুলো হলো: ০ – ১৬ সপ্তাহে ১টি, ২৪ – ২৮ সপ্তাহে ১টি, ৩২ সপ্তাহে ১টি, ৩৬ সপ্তাহে ১টি এবং ৩৬ সপ্তাহের পর অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহ থেকে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো উচিত। প্রথম পরীক্ষার সময় রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করাতে হবে। এ সময় রক্তের গ্রুপ, যৌনরোগ, রক্তে শর্করার পরিমাণ, হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ, জন্ডিস ইত্যাদিও পরীক্ষা করাতে হবে।

খ. গর্ভাবস্থায় অন্যান্য পালনীয় বিষয়

১. **খাদ্য** : গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির উপরই নির্ভর করে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো থাকা। তাই সুষম সহজপাচ্য ও সঠিক পরিমাণ আহার প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় সুষম আহার বলতে বোঝায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বেশি পরিমাণ প্রোটিন, সঠিক পরিমাণ শর্করা ও কম পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও অন্যান্য পদার্থ, যথা– জিঙ্ক, ফলিক এসিড, পটাসিয়াম, সেলেনিয়াম প্রভৃতি। সম্ভব হলে দিনে ১ লিটার দুধ, ১ বা ২ টুকরা মাছ বা মাংস, ১টি ডিম, ১টি বা ২টি ঋতুকালীন ফল, টাটকা শাকসব্জি এবং ভাত ও ডাল পেট ভরে খাওয়া উচিত। নিরামিষভোজীদের দুধের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তা ছাড়া অঙ্কুরিত ছোলাও খাদ্য তালিকায় যোগ করা উচিত। প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস ফোটানো পানি খাওয়া প্রয়োজন।

২. **কোষ্ঠকাঠিন্য** : গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা থাকে। এর সমাধানকল্পে বেশি পরিমাণ শাকসব্জি খাওয়া দরকার। তা ছাড়া শুকনো খেজুর ও বীট খাবার তালিকায় রাখা উচিত।

৩. **দাঁত** : গর্ভাবস্থায় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। তাই এ সময় দাঁত না তোলাই ভাল।

CamScanner

৪. বিশ্রাম : গর্ভাবস্থায় পরিমিত বিশ্রাম দরকার। দুপুরে দুঘন্টা, রাতে আটঘন্টা বিশ্রাম নেয়া উচিত। সব সময় বাঁ পাশে কাত হয়ে শোয়া উচিত। এতে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক হয়।

৫. কাজকর্ম : স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা নেই, তবে ভারী কাজকর্ম করা একেবারেই উচিত নয়।

৬. গোসল : রোজ গোসল করে শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গোসল করার সময় যেন পিছলে পড়ে না যায় সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

৭. কাপড় : গর্ভাবস্থায় ঢিলেঢালা কাপড় পরা উচিত। বাংলাদেশের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুতির কাপড়-চোপড় পরা স্বাস্থ্যসম্মত।

৮. ভ্রমণ : ঝাঁকুনিযুক্ত ক্লান্তিকর ভ্রমণ গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস ও শেষ দুমাস না করাই ভালো। বাসের চেয়ে রেল ও বিমানে ভ্রমণ-ঝুঁকি অনেক কম।

৯. ধুমপান ও মদ্যপান : গর্ভাবস্থায় ধূমপান ও মদ্যপান অনুচিত। তা না হলে কম ওজনের শিশু কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

১০. যৌনমিলন : গর্ভের প্রথম তিন মাস ও শেষ দেড় মাস যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে গর্ভপাত, অকাল প্রসব ও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা (Birth Control Methods & Family Planning)

গর্ভ নিরোধ (Contraception)

গর্ভ নিরোধ হচ্ছে গর্ভ ধারণে বাধা দেয়া, অর্থাৎ শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর সাথে মিলনে বাধা সৃষ্টি করা। পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সন্তানের জন্ম বিভিন্ন উপায়ে রোধ করা সম্ভব। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা গর্ভনিরোধকের নানা পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান সময়ে যেসব গর্ভনিরোধক পদ্ধতি অনুসৃত হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। গর্ভনিরোধক সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়, **অস্থায়ী পদ্ধতি** এবং **স্থায়ী পদ্ধতি**।

ক. অস্থায়ী পদ্ধতি (Temporary Methods)

১. শারীরিক পদ্ধতি : গর্ভনিরোধকের শারীরিক পদ্ধতি হচ্ছে নিরাপদ সময় নির্বাচন ও শিশ্ন বহিষ্করণ :

- নিরাপদ সময় নির্বাচন : মাসিক রজঃচক্রের প্রথম ও শেষ সপ্তাহের দিনগুলোতে ফেলোপিয়ান নালিতে কোন পরিপক্ক ডিম্বাণু থাকে না বলে ঐ সময়কে যৌনমিলনের নিরাপদ সময় বলে।
- শিশ্ন বহিষ্করণ : সঙ্গমকালে শুক্রাণু স্খলনের মুহূর্তে যদি শিশ্নকে প্রত্যাহার করে দেহের বাইরে স্খলিত করা হয় তা হলে শুক্রাণু নিষেক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

২. রাসায়নিক পদ্ধতি : শুক্রনাশক জেলি, ক্রিম, ফেনা বা ফোম বড়ি, জেল প্রভৃতি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যৌনমিলনের আগে স্থাপন করতে হয়। এটি ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যক্ষম থেকে স্খলিত শুক্রাণুকে বিনষ্ট করে দেয়।

৩. যান্ত্রিক পদ্ধতি : জন্মনিরোধক হিসেবে বেশ কয়েক ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে:

- কনডম : এটি পুরুষের ব্যবহারের জন্য এক ধরনের পাতলা, লম্বাটে রবারের থলি। সঙ্গমের পূর্বে শিশ্ন কনডমে আবৃত করে নিলে স্খলিত শুক্রাণু আর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না। কিছু ক্ষেত্রে মহিলাও কনডম ব্যবহার করতে পারে।
- ডায়াফ্রাম : এটি মিলনের পূর্বে জেলি বা ফোম সহযোগে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের সহায়তায় যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং যৌন মিলনের পর অন্ততঃ ৬ ঘন্টা সেখানেই রাখতে হয়। ডায়াফ্রাম ব্যবহারে কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই, বরং জরায়ুর ক্যান্সার এবং কিছু যৌন রোগ প্রতিরোধ সহায়ক।
- স্পঞ্জ : এটি ভিজিয়ে যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং পর মুহূর্ত থেকেই কার্যক্ষম হলে ২৪ ঘন্টা অনবরত প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।

CamScanner

- **অন্তর্জরায়ু গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা** (Intra-uterine contraceptive device, IUCD) : এ ব্যবস্থায় পলিথিন, তামা, রূপা বা স্টেনলেস স্টিল নির্মিত একটি ফাঁস (loop) জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপন করলে তা জরায়ুর ভিতরে নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপনে বাধা দান করে।

চিত্র ৯.২১ : জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি

৪. **শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি :** এ ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ও ইনজেকশন।

- **জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি :** এটি বিভিন্ন অনুপাতে এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মিশ্রণে তৈরি এবং মুখে গ্রহণযোগ্য বড়ি। রজঃচক্রের ৫-২৫তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে বড়ি গ্রহণ করতে হয়। এগুলো মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের উপর কাজ করে ডিম্বপাতে বাধা দেয় এবং জরায়ুকণ্ঠের মিউকাস ঝিল্লিকে শুক্রাণু প্রবেশের বিরোধী করে তোলে। এটি একটি বহুল প্রচলিত জন্মনিরোধক পদ্ধতি কিন্তু অনেক নারীর সাময়িক বমি বমি ভাব, ফোঁটা ফোঁটা স্রাব, উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধির মত উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- **ইনজেকশন :** বেশ কয়েকমাস যাতে গর্ভধারণ ঝুঁকি নিরাপদে এড়ানো যায় তার জন্য ইদানিং এক ধরনের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকায় এর গুণগত মান উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

৫. **গর্ভপাত :** অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ২-৩ মাস বয়সী ভ্রূণকে বিচ্যুত করিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. স্থায়ী পদ্ধতি (Permanent Methods)

জন্মনিরোধের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করাকে **বন্ধ্যাকরণ** (sterilisation) বলে। এটি নিচে বর্ণিত দুধরনের।

১. **ভ্যাসেকটমি (Vasectomy):** এ পদ্ধতিতে পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় দিকের শুক্রনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু বাইরে আসতে না পারে।

২. **টিউবেকটমি (Tubectomy) বা লাইগেশন (Ligation) :** এ পদ্ধতিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ফেলোপিয়ান নালির (ডিম্বনালি) অংশ কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অধিক সন্তানবতী বা যাঁরা একেবারেই আর সন্তান চান না বা গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ তাঁদের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

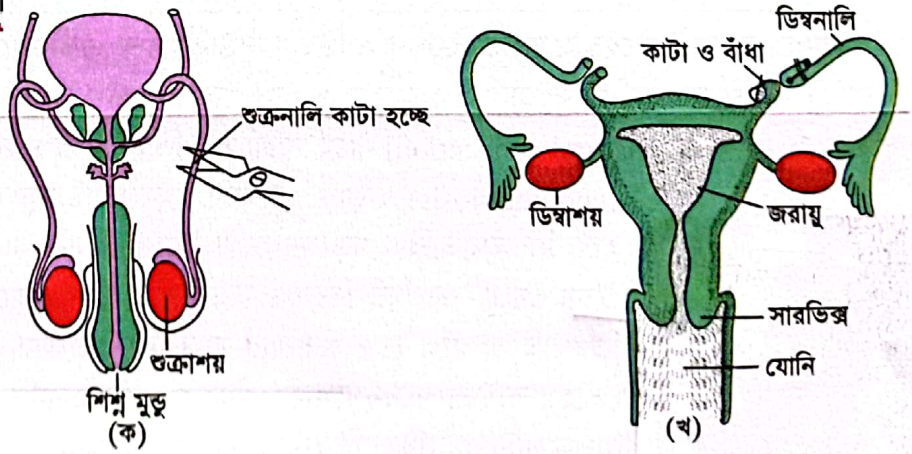

চিত্র ৯.২২ : (ক) পুরুষের বন্ধ্যাকরণে শুক্রনালির অপারেশন (ভ্যাসেকটমি)
(খ) মহিলাদের বন্ধ্যাকরণে ডিম্ববাহীনালির অপারেশন (লাইগেশন)

CamScanner

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আজ নানা কারণে ভয়াবহ অনুভূত হচ্ছে। তাই সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিটি দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম জোরদার করে একে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাও সহজেই বুঝতে পারব। জনবহুলতার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো হচ্ছে : খাদ্যের অপ্রতুলতা; বস্ত্রের অপর্যাপ্ততা; উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব; সুচিকিৎসার অভাব; পরিবেশ দূষণের ফলে বিশুদ্ধ পেয় পানির এমনকি কোন কোন অঞ্চলে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব; শিক্ষার অভাব; অপূরণীয় খনিজ সম্পদের বর্ধিত হারে উত্তোলন ও ব্যবহার; অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা; বেকারত্ব বৃদ্ধি; এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে, মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

প্রত্যেকটি দেশই অনন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। যে কোন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আগে এ দিকটি খতিয়ে দেখতে হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও প্রত্যেক দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে:

১. বিয়ের বয়স : নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স নির্ধারিত থাকবে এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকবে।

২. সন্তান সংখ্যা : দম্পতি পিছু "এক সন্তানই যথেষ্ট"এ শ্লোগান কার্যকর করতে হবে।

৩. বিবাহ বন্ধনের নিয়মকানুন : বিভিন্ন ধর্মমতের বিবাহ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে হবে। কোথাও বহুবিবাহ সিদ্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে সন্তানসংখ্যা সম্পর্কে কঠোর আইন এবং আইন লংঘনকারীর উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।

৪. শিক্ষা : প্রাথমিক পর্যায় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক দম্পতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য দক্ষ মাঠকর্মী নিয়োগ ও অদক্ষদের ছাঁটাই করতে হবে।

৫. গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা : কাঙ্ক্ষিত সন্তানসংখ্যা ও তা নির্দিষ্ট বয়স অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সক্ষম দম্পতিদের স্থায়ী গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করাতে হবে। এ বিষয়ে গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও শহরের ওয়ার্ড কমিশনারদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : নির্ধারিত সময়ের পর বিয়ে এবং এক সন্তান / দুই সন্তানবিশিষ্ট পরিবারকে লেখাপড়া, ভ্রমণ ও চাকুরীতে বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

আইভিএফ পদ্ধতি (IVF–In Vitro Fertilization Process)–কৃত্রিম গর্ভধারণ

সাধারণত নারীদেহের অভ্যন্তরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের মধ্য দিয়ে **নিষেক** সম্পন্ন হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুটি গর্ভাশয়ের প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়ে প্রায় ৯ মাস পর পরিস্ফুটন শেষে একটি শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এ প্রক্রিয়াটি **স্বাভাবিক গর্ভধারণ** (natural conception) নামে পরিচিত। ডিম্বনালি বন্ধ হয়ে গেলে, ক্ষত হলে বা **এন্ডোমেট্রিওসিস** (endometriosis) ছাড়াও পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা কম হলে বা অস্বাভাবিক গড়নের শুক্রাণু হলে, অথবা নারী ও পুরুষ উভয় থেকে শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হলে, নারীতে ডিম্বপাত না হলে IVF গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তখন **দেহের বাইরে গবেষণাগারে কাঁচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ করানোর ব্যবস্থা** করা হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম **ইন ভিট্রো নিষেক** (In Vitro Fertilization, সংক্ষেপে IVF) প্রক্রিয়া। '*in vitro*'

Louise Joy Brown

CamScanner

একটি ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে **কাঁচের ভিতরে** ('within the glass')। প্রক্রিয়াটি **টেস্ট টিউব** পদ্ধতি এবং ভূমিষ্ঠ শিশুটি **টেস্ট টিউব বেবী** নামে সাধারণভাবে প্রচলিত। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই লন্ডনের ওল্ডহ্যাম জেনারেল হসপিটালে **প্যাট্রিক স্টেপ্টো** (Patric steptoe, 1913-1988) এবং **রবার্ট জি. এডওয়ার্ডস** (Robert G. Edwards, 1925-2013) এর তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয় **বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবী লুইস ব্রাউন** (Louise Joy Brown) নামের কন্যা শিশুটি। বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় এ অনন্য অবদানের জন্য রবার্ট এডওয়ার্ডসকে (IVF-এর জনক) ২০১০ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে প্রথম টেস্ট টিউব বেবীর জন্ম হয় ২০০১ সালে।

আইভিএফ পদ্ধতির ধাপসমূহ

আইভিএফ পদ্ধতি ছাড়া আর কোনও উপায়ে গর্ভধারণ সম্ভব নয় নিশ্চিত হলে যে কোনো দম্পতি প্রশিক্ষিত ও আধুনিক হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। সব চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রায় একই ধরনের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে এ ধাপগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাধারণ ধারণা দেয়া হলো।

ধাপ–১. স্বাভাবিক রজঃচক্র দমন : IVF-এর প্রথম ধাপে স্ত্রীর স্বাভাবিক রজঃচক্র দমিয়ে রাখতে একটি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধটি ইনজেকশন হিসেবে কিংবা নাকের ভিতর স্প্রে করে দেয়া হয়।

ধাপ–২. ডিম্বাণুর সরবরাহ বৃদ্ধি : নারীদেহে সাধারণত প্রতিমাসে একটি করে ডিম্বাণু পরিণত (mature) হয়। কিন্তু কৃত্রিম গর্ভধারণের ক্ষেত্রে একাধিক ডিম্বাণুর প্রয়োজন হয় কারণ একটিমাত্র ডিম্বাণু নিয়ে পূর্ণ-চিকিৎসা সম্পন্ন করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। এ কারণে ডিম্বাণুর উৎপাদন বাড়াতে FSH (Follicle Stimulating Hormone) নামে হরমোনযুক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি ডিম্বাণু উৎপাদিত হলে বেশি ডিম্বাণু নিষিক্ত করে যাচাই-বাছাইয়ে সুবিধা হবে। এভাবে ডিম্বাশয়কে বেশি ডিম্বাণু উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করা হয়।

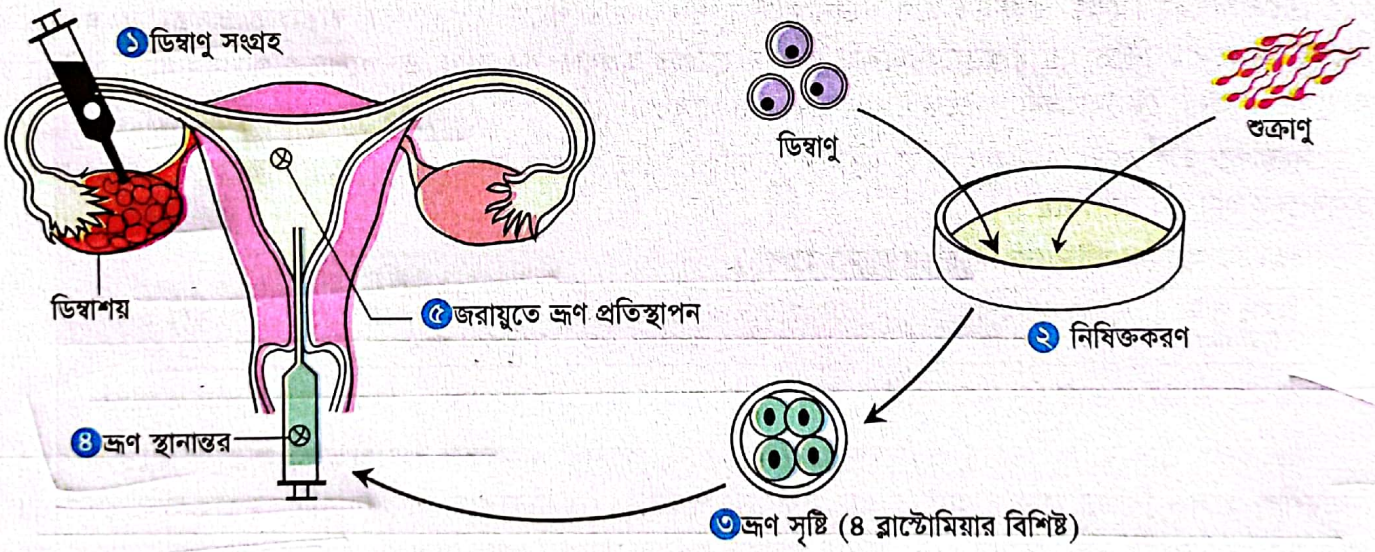

চিত্র ৯.২৫ : আই.ভি.এফ এর বিভিন্ন ধাপ

ধাপ–৩. অগ্রগতি পরীক্ষা : ডিম্বাণু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োগিত হরমোনের ফলাফল পরীক্ষা করা হয় তৃতীয় ধাপে। এ জন্য আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান (বা ছবি) ও হরমোনের মাত্রা যাচাইয়ের জন্য রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়।

ধাপ–৪. ডিম্বাণু সংগ্রহ : ডিম্বাণু সংগ্রহের ৩৪-৩৮ ঘন্টা আগে ডিম্বাণু পরিপক্কতায় সাহায্য করতে আরেকবার হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। **ডিম্বাণু চোষক** (follicular aspiration) প্রক্রিয়ায় নারীদেহের ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। এর আগে অবশ্য ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়। আল্ট্রাসাউন্ড ছবির সূত্র ধরে যোনি পথে একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সূঁচ প্রবেশ করিয়ে ডিম্বাশয় ও ফলিকলে (ডিম্বথলিতে) আবৃত ডিম্বাণুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সূঁচটি চোষক যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো থাকে। এ যন্ত্র ডিম্বাশয়ের ফলিকল থেকে সামান্য তরলসহ ডিম্বাণু সংগ্রহ

CamScanner

করে। এভাবে একটি একটি করে সুস্থ ও পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগৃহীত হয়। একটি ডিম্বাণু সংগ্রহের পর সেটি নির্ধারিত পাত্রে রেখে আবার আরেকটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহের পর নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় (নারীদেহের সমান তাপমাত্রায়) সংরক্ষিত থাকে।

ধাপ–৫. শুক্রাণু সংগ্রহ : নারীর ডিম্বাণু সংগ্রহের সময়কালে পুরুষ সঙ্গীকে শুক্রাণু দানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শুক্রাণু সংগ্রহের পর কিছু সময়ের জন্য কালচার মিডিয়ামে জমা রাখা হয়। এর পর তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বীর্যরস পরিষ্কার করে দ্রুতগতিতে ঘূর্ণনের মাধ্যমে সুস্থ ও সক্রিয় শুক্রাণু নির্বাচন করা হয়।

ধাপ–৬. ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ : গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে নিষেকের জন্য একসঙ্গে ১৬-২০ ঘন্টা পেট্রিডিশ বা কাঁচের টিউবে রেখে দেয়া হয়। প্রত্যেক ডিম্বাণুর জন্য প্রায় একলক্ষ শুক্রাণুর ব্যবস্থা রাখা হয়। এরপর পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনো ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়েছে কিনা। নির্ধারিত সময় পর যদি নিষেক না ঘটে থাকে তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে একটি ডিম্বাণুর ভিতরে একটি শুক্রাণুর প্রবেশ ঘটিয়ে নিষেকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম **অন্তঃসাইটোপ্লাজমিক শুক্রাণু ইনজেকশন** (intracytoplasmic sperm injection, সংক্ষেপে ICSI)। নিষেক ঘটেছে এবং ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হয়েছে এমন অবস্থা দেখা দিলেই নিষিক্ত ডিম্বাণুকে ভ্রূণ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ধাপ–৭. ভ্রূণ স্থানান্তর : নিষিক্ত ডিম্বাণু সংগ্রহের পর ১-৬ দিনের মধ্যে (সাধারণত ২-৩ দিনের মধ্যে) নারীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। এ সময়ের ভিতর নিষিক্ত ডিম্বাণু ২-৪ ব্লাস্টোমিয়ার বিশিষ্ট ভ্রূণে রূপ নেয়। একটি সুস্থ, সক্রিয় বিভাজনশীল ভ্রূণকে ক্যাথেটারের সাহায্যে আল্ট্রাসাউন্ড প্রতিচ্ছবি দেখে গর্ভাশয়ে সাবধানে স্থাপন করা হয়। এটি একটি ব্যথাহীন প্রক্রিয়া, তবে কেউ পেশিতে সামান্য খিল ধরায় আক্রান্ত হতে পারে। ভ্রূণ যদি জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয়ে সংস্থাপিত হয় তাহলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে মনে করা হয়। এরপর ১০ মিনিট থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভবতী বাসায় চলে যেতে পারেন। কেউ একাধিক ভ্রূণ গর্ভাশয়ে সংস্থাপন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত অবস্থা, বয়স প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনায় নিতে হয়। অনেকে একটি ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর বাকি ভ্রূণগুলোকে গবেষণাগারে ভবিষ্যতে সংস্থাপনের জন্য, কেউবা অন্য কাউকে দান করার জন্য গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জমা রাখেন।

সংস্থাপনের পরবর্তী সময়কালটি সুনির্দিষ্ট নজরদারির মধ্যে থাকতে হয়। কারণ IVF পদ্ধতিতে জীবিত সন্তান জন্মদানের হার খুব বেশি নয়।

পদ্ধতির সার্বিক ঘটনাকে নিচে দেখানো হলো।

ডিম্বাণু সৃষ্টির উদ্দীপনা ⇨ ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ ⇨ টেস্টটিউবে ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিশ্রণ ও নিষেক ⇨ ইনকিউবেটরে ভ্রূণ কালচার ⇨ জরায়ুতে ভ্রূণ স্থানান্তর ও সংস্থাপন

যেসব কারণে আই.ভি.এফ ব্যর্থ

সাধারণত স্ত্রীর বয়স, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গুণগত মান, প্রজনন অক্ষমতার মেয়াদকাল, জরায়ুর স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন কারণে আইভি.এফ সফলতা পায়না : (i) ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর পরিপক্কতার জন্য যে সময় প্রয়োজন সে সম্পর্কে ভুল অনুমান। (ii) ডিম্বাণু পরিণত হওয়ার আগেই পৃথক করা। (iii) পৃথকীকরণের সময় ডিম্বাণু নষ্ট হলে। (iv) নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের বিকাশ না হওয়া। (v) ভ্রূণের ত্রুটিপূর্ণ প্রতিস্থাপন। (vi) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ত্রুটির কারণে আই.ভি.এফ ব্যর্থ হয়।

আইভিএফ-এর সুবিধা-অসুবিধা

আইভিএফ-এর সুবিধা : এতে মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি। ডিম্বনালি ক্ষতিগ্রস্ত থাকলেও গর্ভধারণ সম্ভব। এর দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

আইভিএফ-এর অসুবিধা : বেশিবার গর্ভধারণে গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে। এটি ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মানসিক চাপে স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিতে পারে।

CamScanner

টেস্ট টিউব শিশুদের বিকলাঙ্গতা ও বিরল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে বলে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন। ডিম্বাণু সংগ্রহের সময় ডিম্বাশয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রক্তক্ষরণ ও পরবর্তীতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। অনেকে টেস্ট টিউব বেবি নেয়াকে অনৈতিক মনে করেন কেননা এ পদ্ধতিতে অনেক ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আই.ভি.এফ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতাও কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুন্ন হয়। শুক্রাণু, ডিম্বাণু ও একটি জরায়ু হলেই এ পদ্ধতিতে গর্ভধারণ সম্ভব। আজকাল দেখা যায় যে, জরায়ুতে সমস্যা থাকলে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের শুক্রাণু-ডিম্বাণু দিয়ে তৈরি ভ্রূণ অন্য কোনো নারীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করছেন। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে আগত শিশুর মানসিকতা। বয়সের সঙ্গে মা-বাবার পরিচয় নিয়েও তার মনের ভিতর সংশয় তৈরি হতে পারে। কৃত্রিম পরিবেশে ভ্রূণ সংরক্ষণ করার সময় ভ্রূণের সাথে অপ্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটানোর ফলে গবেষণার উদ্দেশ্যে ভ্রূণের অপব্যবহারের শঙ্কা থাকে। তাছাড়া ভ্রূণকে পণ্যের মতো ব্যবহারের শঙ্কা রয়েই যায়। এত সবের পরও থেমে নেই আই.ভি.এফ পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম। সন্তান ধারণের মাঝ দিয়ে নারী পায় তার পূর্ণতা। তাই প্রজনন সংক্রান্ত প্রতিকূলতার কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নন প্রজননে অক্ষম পুরুষ ও নারীকুল। মাতৃত্বের আকাঙ্খা পূরণে আই.ভি.এফ পদ্ধতি তাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

প্রথম টেস্টটিউব কুকুরের জন্ম : যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গত ০৯/১২/২০১৫ তারিখে আইভিএফ পদ্ধতিতে সাতটি কুকুরছানার জন্ম দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে এসব গবেষকেরা একটি কুকুরীর জরায়ুতে ১৯টি ভ্রূণ স্থাপন করে এ সাফল্য পান। বিজ্ঞানীদের এ সাফল্যের প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। কারণ এ আইভিএফ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রাণী সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত : বাংলাদেশে প্রথম ত্রয়ী টেস্টটিউব বেবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করে হীরা, মনি ও মুক্তা। এদের জন্ম হয় ২০০১ সালের ৩০ মে। এদের পিতা ও মাতা যথাক্রমে আবু হানিফ এবং ফিরোজা বেগম। এ দম্পতি Bangladesh Assisted Conception Center (BACC) and Women's Hospital (WH), ঢাকা এর Dr. Fatema Parveen এর তত্ত্বাবধায়নে ১৯৯৪ সাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ৬ বছর পর সন্তানত্রয় জন্মদানে সক্ষম হন। বর্তমানে বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি নিয়ে সাফল্যজনকভাবে কাজ চলছে। বেসরকারীভাবে বেশ কয়েকটি আই.ভি.এফ সেন্টার রয়েছে।

প্রজননতন্ত্রের সমস্যা (Problems of Reproductive System)

পুরুষ ও নারীর প্রজনন অক্ষমতা (Male and Female Infertility)

কোনো গর্ভনিরোধক পদার্থ বা পদ্ধতি ব্যবহার না করে এক বছর নিয়মিত দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরও যদি কোনো দম্পতি গর্ভধারণে ব্যর্থ হয় তখন তা প্রজনন অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে। দম্পতির পুরুষ সঙ্গী, নারী সঙ্গী কিংবা উভয়েই প্রজননিক সমস্যায় ভুগতে পারে। অর্থাৎ তারা **অনুর্বর** (infertile)। অনুর্বর বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট নারী-পুরুষ দম্পতির সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কম। তার মানে এ নয় যে তারা সন্তান উৎপাদনে **অক্ষম বা বন্ধ্যা** (sterile)। বন্ধ্য বা বন্ধ্যা যাই বলি না কেন তারা কোনদিন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হবে না, কিন্তু অনুর্বর ব্যক্তি-দম্পতি চিকিৎসার কল্যাণে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানে সক্ষম। পৃথিবীর ১৫% দম্পতি অনুর্বর (infertile) কিন্তু মাত্র ১-২% দম্পতি বন্ধ্যা বা বন্ধ্য (sterile)। নিচে পুরুষ ও নারীর প্রজননিক সমস্যার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

পুরুষে প্রজননিক সমস্যার কারণ (Cause of Male Infertility)

দম্পতির পুরুষ সদস্যে প্রজননিক সমস্যার মূলে রয়েছে নিচে বর্ণিত শুক্রাণুগত বিশৃঙ্খলা।

১. বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি (Absence of sperm) : বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতিকে অ্যাজুস্পার্মিয়া (azoospermia) বলে। শুক্রাণু উৎপাদন না হওয়া বা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে বীর্যে শুক্রাণু অনুপস্থিত থাকতে পারে।

CamScanner

২. বীর্যে শুক্রাণু সংখ্যার স্বল্পতা (Low sperm count) : বীর্যে শুক্রাণু সংখ্যার স্বল্পতাকে অলিগোস্পার্মিয়া (oligospermia) বলে। এক্ষেত্রে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ২০ মিলিয়নের কম থাকে। অলিগোস্পার্মিয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণ জানা নেই।

৩. শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা (Abnormal sperm) : অনেক শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছতে বা নিষেক ঘটাতে অক্ষম। দুটি লেজ থাকা, লেজবিহীন, মস্তকবিহীন বা অস্বাভাবিক আকৃতি ইত্যাদি হলো শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা।

৪. অটোইম্যুনিটি (Autoimmunity) : নিজের শুক্রাণুর প্রতি বিশেষ ইম্যুন প্রতিক্রিয়া ৫-১০% পুরুষ বন্ধ্যাত্বের কারণ। রক্তে শুক্রাণু প্রতিরোধী আয়ন থাকা এক ধরনের ইম্যুন প্রতিক্রিয়া।

৫. বীর্যপাতে অক্ষমতা (Retrograde ejaculation) : ডায়াবেটিস, স্পাইনাল ইনজুরি, প্রস্টেট সার্জারি, সেমিনাল ভেসিকলের ক্ষত বা মুখ বন্ধ থাকা ইত্যাদি কারণে শুক্রাণু উৎপাদনে সক্ষম পুরুষ অনেক সময় বীর্যপাত করতে পারে না বা কম বীর্যপাত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অস্বাভাবিক বীর্যপাত, যেমন-বীর্য নিজদেহে পশ্চাৎমুখী হয়ে মূত্রথলিতে পতিত হয়, অর্থাৎ দেহের বাইরে বীর্যরস নির্গত হয় না। এ সব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রজনন অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

৬. পুরুষত্বহীনতা (Impotence) : কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক কারণে অকাল বীর্যপতন কিংবা লিঙ্গ উত্থানজনিত সমস্যার কারণে পুরুষত্বহীনতা (নপুংসকতা) দেখা দেয় যা প্রজনন অক্ষমতারই নামান্তর।

৭. ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (Side effects of Medicines) : চর্মরোগ, ক্যান্সার, পেটের আলসার, যক্ষ্মা, ডিসলিপিডেমিয়া, খিচুনি, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৮. যৌন বাহিত রোগ (Sexually transmitted diseases) : কিছু যৌন বাহিত রোগ, যেমন-গনোরিয়া, সিফিলিস, ইত্যাদি দ্বারা প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হলে শুক্রাণু উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, শুক্রাণুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং শুক্রাণুর গমন পথ বাধাগ্রস্থ হয়। তবে এসব সংক্রমণ চিকিৎসা দ্বারা সারানো যায়।

৯. ভেরিকোসেলিস (Varicoceles) : পুরুষের অণ্ডথলির প্রাচীরে বিদ্যমান প্যামপিনিফর্ম প্লেক্সাস শিরা। (pampiniform plexus veins) ফুলে গিয়ে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করে। এর ফলে শুক্রাশয়ের শুক্রাণু উৎপাদন হ্রাস পায় এবং শুক্রাণুর গুণগত মান নষ্ট হয় যা পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার জন্য দায়ী। প্রায় ২০% কিশোর ও ১৫% পরিণত পুরুষ এরোগ দ্বারা আক্রান্ত।

১০. জিনগত রোগ (Genetic diseases) : অনেকক্ষেত্রে জিনগত রোগ **সিস্টিক ফাইব্রোসিস** (Cystic fibrosis) অথবা ক্রোমোজোমের অস্বাভাকিকতা পুরুষের প্রজনন অক্ষমতা কারণ হয়ে থাকে।

১১. অন্যান্য কারণ (Others factors) : রেডিওথেরাপি, এমআইআর, এক্সরে, অতিমাত্রার তাপ, শুক্রাশয়ে আঘাত, দীর্ঘ মেয়াদি অসুস্থতা, দীর্ঘ সময় সাইকেল চালনা, আটসাট আণ্ডারওয়ার পরিধান, প্রতিনিয়ত গরম পানি দিয়ে গোসল করা; স্থূলতা, ধূমপান, মধ্যপান, মাদকগ্রহণ, দুশ্চিন্তা, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়।

নারীতে প্রজননিক সমস্যার কারণ (Cause of Female Infertility)

নারীদেহে যে সব কারণে প্রজননিক সমস্যা দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. ডিম্বপাতে ব্যর্থতা (Failure to ovulate) : প্রায় ১০% নারী ডিম্বপাতে ব্যর্থ বলে প্রজননিক বিষয়েও বিফল হয়। ডিম্বপাতে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে হরমোনঘটিত। কখনও হাইপোথ্যালামাস বা পিটুইটারি গ্রন্থি স্বাভাবিকভাবে হরমোন ক্ষরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ডিম্বাণুর ফলিকল (ডিম্ব থলি) পরিস্ফুটিত হয় না, ডিম্বপাতও ঘটে না। অন্যদিকে, ডিম্বাশয় থেকে স্বাভাবিক হরমোনগুলো ক্ষরিত না হওয়ায় কিংবা ডিম্বাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে নির্ধারিত হরমোন ক্ষরিত হয় না বলে ডিম্বপাত ঘটে না। তবে খুশির কথা এই যে ৯০% ক্ষেত্রে হরমোন ক্ষরণে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সংশ্লেষিত হরমোন ভাল কাজ দেয়।

২. ডিম্বনালির ক্ষত (Damage to the oviducts) : প্রায় ৩৫% নারীর প্রজনন অক্ষমতার জন্য ডিম্বনালির ক্ষতকে দায়ী করা হয়। জীবাণু সংক্রমণ, এন্ডোমেট্রিওসিস, পেলভিক সার্জারি কিংবা অন্য কোনো কারণে ডিম্বনালি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এর ফলে ডিম্বনালিপথে জরায়ুতে ডিম্বাণু পরিবহন ব্যাহত হয়।

CamScanner

৩. জরায়ুর ক্ষত (Uterus damage): প্রায় ৫–১০% নারী জরায়ু-ক্ষতজনিত সমস্যার কারণে প্রজননিক জটিলতায় ভোগে। এমন ক্ষেত্রে গর্ভধারণ সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা গর্ভপাত ঠেকানো। জরায়ুতে ছোট-বড় টিউমার হলে শল্য চিকিৎসায় সারানো যায়। গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহারে ভাল কাজ করে। কখনওবা জন্মগতভাবে বিকৃত গড়নের জরায়ু দেখা যায়।

৪. সার্ভিক্স বা জরায়ু গ্রীবার ক্ষত (Injury to the cervix) : কৃত্রিম গর্ভপাত বা স্বাভাবিক সন্তান প্রসবকালে সারভিক্স বা জরায়ুমুখে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষতের টিস্যু সারভিক্সকে সংকীর্ণ কিংবা প্রশস্ত করে দিতে পারে, এমনকি সারভিক্সের মিউকাস ক্ষরণ বন্ধ করে দিতে পারে। সরু সারভিক্স এবং মিউকাসের ঘাটতির কারণে শুক্রাণুর ঊর্ধ্বগমন ব্যাহত হয়। সারভিক্স বেশি প্রশস্ত হলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সারভিক্স বা জরায়ুমুখে ঘা বা ক্ষত থাকলে সেখানে নানা ধরনের জীবাণু বাসা বাঁধে এবং অস্বাভাবিক রজঃস্রাবের উৎপত্তি হয়। এসব কারণে শুক্রাণুর বিচলন শক্তি কিংবা তার জীবনীশক্তি কমে যেতে পারে।

৫. শুক্রাণুর প্রতি অ্যান্টিবডি (Antibodies to sperm) : কিছু দুর্লভ ক্ষেত্রে নারী তার স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। জরায়ু, সার্ভিক্স (জরায়ু-গ্রীবা) ও ডিম্বনালিতে এগুলো পাওয়া যায়। ওষুধ প্রয়োগে অনাক্রম্যতন্ত্র দমিয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করতে পারলেও আইভিএফ (IVF) সবচেয়ে ভালো পন্থা বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

৬. উচ্চ মাত্রার LH বা প্রোল্যাকটিন (Hyperprolactinemia) : রক্তে উচ্চ মাত্রার লুটিওট্রফিক হরমোন (LH) বা প্রোল্যাকটিন বিভিন্ন গোনাডোট্রফিক হরমোনের ক্ষরণ হ্রাস করে ডিম্বাণুজননে (oogenesis) বাধার সৃষ্টি করে। কিছু ওষুধ, যেমন–জন্ম নিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ি গ্রহণের কারণে রক্তে প্রোল্যাকটিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

৭. জন্মগত ত্রুটি (Congenital abnormalities) : অপ্রজননতন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি বিশেষ করে জরায়ু ও যোগির গঠনের জন্মগত ত্রুটির কারণে মহিলাদের প্রজনন অক্ষমতা দেখা যায়।

৮. অজানা কারণ (Unknown causes) : অনেক নারীর প্রজননের অক্ষমতার কারণ আজও জানা যায়নি। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম প্রায় ১০% মহিলা এ ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত।

৯. অন্যান্য সমস্যা (Other problems) : ডায়াবেটিস, ধুমপান, স্টেরয়েড ওষুধ, মদ্যপান, দেহের অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি কারণে নারীর প্রজনন অক্ষমতা দেখা দেয়।

প্রজনন অক্ষমতার কারণ নির্ণয়ে পরীক্ষা

(i) স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করানো; (ii) স্বামীর বীর্য পরীক্ষা করানো; (iii) স্ত্রীর ডিম্বাণু তৈরি ও নিঃসরণ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করানো; (iv) জরায়ু ও ডিম্বনালি পরীক্ষা করানো; (v) জরায়ুর ভিতরের স্তরের ঝিল্লি পরীক্ষা করানো; (vi) স্বামী ও স্ত্রীর হরমোন পরীক্ষা করানো।

প্রজনন অক্ষমতায় চিকিৎসা

আধুনিক চিকিৎসা এবং অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী উভয়ের বন্ধ্যাত্ব দূর করা যায়। যেমন–

১. আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি (Modern treatment techniques) : এন্ডোস্কোপিক সার্জারি, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, থার্মাল বেলুন ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে প্রজনন অক্ষমতা দূর করা যায়। যেসব রোগের কারণে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় সেসব রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে প্রজনন অক্ষমতা দূর করা সম্ভব।

২. ওষুধ সেবন (Use of Drugs) : অনিয়মিত রজঃচক্রের সমস্যাযুক্ত মহিলাদের হরমোনযুক্ত কিছু ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। যেমন-ক্লোমিফেন সাইট্রেট, হিউমেন মেনোপোজাল গোনাডোট্রফিন, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন জাতীয় ওষুধ সেবন করা হয়।

৩. আইভিএফ পদ্ধতি (IVF Techniques) : প্রকৃতিগত পদ্ধতি বাদ দিয়ে কৃত্রিম পরিবেশে জরায়ুর বাইরে আবাদ মাধ্যমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষকে একত্রে রেখে নিষেক ঘটানোকেই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা IVF বলে। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি। এটি টেস্ট টিউব বেবি পদ্ধতি নামে অতি পরিচিত।

৪. ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেশন (Intra Uterine Insemination-IUI) : একে কৃত্রিম গর্ভধারণ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতি অধিক ঘনত্বের সক্রিয় শুক্রাণুযুক্ত বীর্যকে সার্ভিক্সের মধ্য দিয়ে সরাসরি জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়।

CamScanner

৫. ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (Intra Cytoplasmic Sperm Injection-ICSI) : এ পদ্ধতিতে নিষেক ঘটানোর জন্য একটি সক্রিয় শুক্রাণুকে মাইক্রোইনজেকশনের মাধ্যমে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করানো হয়।

পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা
(Imbalance of Reproductive Hormones of Male and Female)

প্রজননতন্ত্র মানুষের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গতন্ত্র। এর সুষ্ঠু কর্মকাণ্ডও সম্পন্ন হয় কয়েকটি প্রধান ও অপ্রধান প্রজননিক হরমোনের সক্রিয়তায়। এসব হরমোনের কার্যকারিতায় পরিচিত নারী ও পুরুষ একেক সময় একেক রূপে অবির্ভূত হয় বলে মনে হয়। নিচে পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

ডিম্বাশয় থেকে অনেক হরমোন ক্ষরিত হয়। তার মধ্যে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন প্রধান। এসব হরমোনের ক্ষরণের মাত্রা কম-বেশি হলে স্বভাবতই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ইস্ট্রোজেন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার ইস্ট্রোজেন : ৩৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারীর দেহে উচ্চ মাত্রার ইস্ট্রোজেন থাকে। এ সংক্রান্ত জটিলতাকে বয়স ও রজঃচক্রজনিত স্বাভাবিক সমস্যা হিসেবে মেনে নিয়ে নারীরা দিন কাটায়। উচ্চমাত্রার ইস্ট্রোজেনের ফলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার মধ্যে রয়েছে প্রাক-রজঃচক্রীয় সিন্ড্রোম (pre-menstrual syndrome, PMS)। এর ফলে স্তন ফুলে যায়, স্পর্শকাতর ও ব্যথাকাতর হয়; শরীরে পানি জমে, ওজন বেড়ে যায়; ব্রণ উঠে, স্তনবৃন্ত থেকে স্রাব নির্গত হয়; ভালো ঘুম হয় না, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়; দুর্বল লাগে; মাথা ব্যথা, মাইগ্রেন, স্তনব্যথা, পিঠের নিচে ব্যথা হয়; মিষ্টি ও নোনতা খাবারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে; আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে; কোনো কাজে মন বসে না; স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে পারে; সহবাসে অনাগ্রহ জন্মে, কিংবা গর্ভপাতও হতে পারে।

নিম্নমাত্রার ইস্ট্রোজেন : রজঃনিবৃত্তকালে নিম্নমাত্রার ইস্ট্রোজেন থাকা স্বাভাবিক। তবে কারও জরায়ু অপসারিত হলে, কেমোথেরাপি বা বিকিরণ থেরাপির সম্মুখীন হলে তাদের শরীরেও ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। ইস্ট্রোজেন মাত্রা কম হলে যোনিদেশের চারপাশের প্রাচীর পাতলা হয়ে শুকিয়ে যায় যে কারণে সহবাস কষ্টদায়ক হয়। এর ফলে ইউরেথ্রার প্রাচীরও পাতলা হয়ে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া, অবসাদ, রাতে ঘাম হওয়া, মনোযোগে বিঘ্ন ঘটা, সন্ধিব্যথা, ত্বক শুষ্ক হওয়া, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, আতঙ্কগ্রস্ত থাকা ইত্যাদিও কম ইস্ট্রোজেনের কুফল।

প্রোজেস্টেরন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরন : প্রোজেস্টেরন সাধারণত রজঃচক্রকালে ক্ষরিত হয়। যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে তাদের দেহে এ হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। অবসাদ ও যন্ত্রণাহরণকারী বা ব্যথানাশক ওষুধ সেবনেও প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বেড়ে যায়, রজঃস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং ইউরেথ্রার প্রাচীরে প্রভাব বিস্তার করে। দেহে উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরনের লক্ষণ হচ্ছে– বুকে ব্যথাপ্রবণতা ও স্ফীত হওয়া, অস্থির মেজাজ, অতিরিক্ত ঘুমভাব, কার্যকর ইস্ট্রোজেন স্বল্পতা ইত্যাদি।

নিম্নমাত্রার প্রোজেস্টেরন : নারীদেহে প্রোজেস্টেরন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের একটি। দেহের অনেক সূক্ষ্ম কাজের উদ্দীপক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এটি অন্যতম মৌলিক হরমোন যা প্রয়োজনে ইস্ট্রোজেন ও কর্টিসোন উৎপন্ন করে। দেহে নিম্নমাত্রার প্রোজেস্ট্রেরনের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে– অনুর্বরতা, পিত্তথলির অসুখ, অনিয়মিত রজঃচক্র, রজঃচক্রের সময় রক্তজমাট, স্তনব্যথা, শুষ্ক যোনিদেশ, কম ব্লাড-সুগার, অবসাদ, ম্যাগনেসিয়াম স্বল্পতা প্রভৃতি।

অ্যান্ড্রোজেন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন : নারীদেহে অ্যান্ড্রোজেনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে প্রয়োজনে ইস্ট্রোজেন নামক স্ত্রীহরমোনে পরিবর্তিত হওয়া। এসব হরমোন রজঃনিবৃত্তির আগে, সময়কালীন ও পরবর্তী সময় জননতন্ত্র, অস্থি, বৃক্ক,

CamScanner

যকৃত ও পেশিসহ দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও সেগুলোর কাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। যৌন উত্তেজনা ও মিলনেও অ্যান্ড্রোজেন প্রভাব বিস্তার করে। দেহে উচ্চমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন উপস্থিতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে– অনুর্বরতা, রজঃচক্র অনিয়মিত হওয়া বা একেবারে না হওয়া, পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome, PCOS), অস্বাভাবিক স্থান লোমশ হওয়া (যেমন–মুখমন্ডল, ঠোঁট প্রভৃতি জায়গায়), চুল কমে যাওয়া, ব্রণ দেখা দেয়া, ভাল কোলেস্টেরল কমে যাওয়া, খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, উদরের চতুর্দিক ঘিরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি।

নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন : নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেনে সব বয়সের নারীরা বিভিন্ন জটিলতায় ভুগতে পারে। তবে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে প্রাক রজঃনিবৃত্ত ও রজঃনিবৃত্তকালীন নারী। এ সময় পিটুইটারি গ্রন্থিতে টিউমার দেখা দিতে পারে এবং হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। অবসাদ, উত্তেজনা হ্রাস, ভাল মন্দের বাছবিচার থাকে না, যোনিদেশে শুষ্কতা প্রভৃতি নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেনসংক্রান্ত জটিলতার লক্ষণ।

পুরুষে প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

টেস্টোস্টেরন পুরুষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। জননক্ষম পুরুষে এটি নিয়মিত শুক্রাশয়ে উৎপন্ন ও রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে দেহ সুস্থ রাখে। এ হরমোন পুরুষে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (পেশল দেহ, দাড়ি-গোঁফের প্রকাশ, কণ্ঠ পুরু ও স্বর গভীর করে তোলে, যৌনাঙ্গ সুগঠিত ও বড় করে) প্রকাশ ঘটায়। এ হরমোন যৌন উদ্দীপনাকে তাড়িত করে এবং FSH (Follicle Stimulating Hormone)-এর সহযোগিতায় শুক্রাণু সৃষ্টিতে উদ্দীপনা যোগায়। বয়স্ক পুরুষে যাদের যৌনশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, কিছু গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিলোপ ঘটে। তারা হরমোন প্রতিস্থাপনার মাধ্যমে পুনর্যৌবন ফিরে পেতে চায় কিন্তু এতে হিতে বিপরীত ফল হয়, প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার ও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস-এর আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষে টেস্টোস্টেরনের ভারসাম্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠে। গড়ে ৪০–৫০ বছরের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হতে থাকে।

১. **অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল অনুভব :** এ লক্ষণ নানাভাবে প্রকাশ হতে পারে, যেমন– খাওয়ার পর ক্লান্তিবোধ, স্বাভাবিকের চেয়ে কম কাজ করতে পারা, সারাদিনের সামগ্রিক কাজের পারফরমেন্স নিচুমাত্রার এবং সারাদিন অবসাদগ্রস্ত থাকা। তা ছাড়া, মিলন আকাঙ্ক্ষা কমে যাওয়া, ঘাম হওয়া, গায়ে ব্যথা হওয়া, যৌনাঙ্গ কর্মক্ষম না হওয়া প্রভৃতিও টেস্টোস্টেরন হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফল।

২. **অকালে বুড়িয়ে যাওয়া :** দৈহিক ও মানসিকভাবে বুড়িয়ে যাওয়া এ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফল। চুল পাতলা বা ধূসর হয়ে যাওয়া, হাড়ের ঘনত্ব ও চামড়ার ঔজ্জ্বল্য কমে যাওয়া, কোমরে চর্বি জমা, স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া, ঘুম না হওয়া প্রভৃতি এ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফলে ঘটে।

৩. **অসুখিভাব :** টেস্টোস্টেরন হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানবোধ কমে যায়। দুশ্চিন্তা, স্নায়ুদৌর্বল্য বেড়ে যাওয়া, বিষন্নতায় ভোগা, কোনো ধরনের উদ্যোগ বা প্রতিযোগিতাহীনতার প্রকাশ, উত্তেজিত হয়ে উঠা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

৪. **যৌন উত্তেজনা কমে যাওয়া :** টেস্টোস্টেরনের ভারসাম্যহীনতায় যৌন উত্তেজনা কমতে কমতে একেবারে কমে যায়। এমনকি যৌনাঙ্গ উত্থানেও অক্ষম হয়ে পড়ে। পুরুষে টেস্টোস্টেরনের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ৩৫০–১২৩০ ন্যানোগ্রাম [এক ন্যানোগ্রাম = এক গ্রামের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ]। এভাবে টেস্টোস্টেরন হরমোনের অভাবে যৌন উত্তেজনা হ্রাস, যৌনাকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি ও পৌরষত্বের প্রকাশহীনতাকে অ্যান্ড্রোপজ (andropause) বলে। অ্যান্ড্রোপজকে নারীর মেনোপজ (menopause) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সমস্যা (Problems During Foetal Development)

ভ্রূণের বৃদ্ধি ও সন্তান ভূমিষ্ঠের ক্ষেত্রে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভ্রূণের বৃদ্ধি ও সঠিক জন্মদানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৭% সফল বলে দাবী করেছে CDC (2011)। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে একটি সুস্থ সবল শিশুর জন্মদানে কতখানি সর্তক থাকতে হয় সে বিষয়ে সাধারণ ধারণা অর্জনের জন্য এখানে ভ্রূণের

CamScanner

বৃদ্ধির সময় কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং সাম্প্রতিককালে এসব সমস্যার মোকাবিলার উপায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সমস্যা অন্তহীন। সমস্ত সমস্যাকে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : **(ক) জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা এবং (খ) টেরাটোজেনজনিত সমস্যা।**

ক. জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা (Genetic and Chromosomal problems)

প্রকট ও প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে জন্মের শুরুতেই সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। অটোজোমের মধ্যে অবস্থিত জিনগুলো **অটোজোমাল ব্যাধি** (autosomal disorder)-র সৃষ্টি করে। X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর কর্মকান্ডে দেখা দেয় সেক্স-লিংকড রোগব্যাধি। নিচে কয়েকটি ব্যাধির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অটোসোমাল ব্যাধি : অধিকাংশ প্রচ্ছন্ন অটোজোমাল রোগের বিকাশ ভ্রূণে হলেও প্রকাশ ঘটে জন্মের ঠিক পর মুহূর্তে বা শিশু বয়সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশ হাজার শিশুর মধ্যে একজনে এমন একটি অসুখ দেখা যায় যা একটি প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে হয়ে থাকে। এ জিনের প্রভাবে শিশু **ফিনাইলঅ্যালানিন** (phenylalanine) নামক অ্যামিনো এসিড হজম করতে পারে না। এ কারণে মস্তিষ্কে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে শিশুকে মানসিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত করে। এ অসুখের নাম **ফিনাইলকিটোনিউরিয়া** (Phenylketonuria)। প্রকট জিনের ব্যাধি হিসেবে **হ্যান্টিংটন-স ব্যাধি** (Huntington's disease) বিখ্যাত। এ রোগ আবার শিশু পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ পায় না। এতে মস্তিষ্কের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্য ত্বরান্বিত হয়। রোগ শনাক্তের জন্য আগে শিশুকে পূর্ণবয়স্ক হতে হতো, এখন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আরো আগেই শনাক্ত করা যায়।

২. সেক্স-লিংকড ব্যাধি : লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়া এ দুটি অতিপরিচিত সেক্স-লিংকড ব্যাধি। প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে এ অসুখ হয়। আরেকটি অসুখ আছে তার নাম **ফ্র্যাজাইল-X সিন্ড্রোম** (Fragile-X Syndrome)। প্রতি চার হাজার পুরুষের একজন আর প্রতি আট হাজার নারীর একজন এ অসুখে ভোগে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি X ক্রেমোজোমে ভঙ্গুর বা ক্ষতিগ্রস্ত একটি জায়গা আছে। শিশুর বয়স যতো বাড়ে অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্টতার মাত্রা ততো কমে যায়। কারণ এটি মানসিক প্রতিবন্ধীগত এবং **অটিজম** (autism)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত রোগ।

৩. ট্রাইসোমি (Trisomy) : এটি ক্রোমোজোমঘটিত অন্যতম রোগ। ক্রোমোজোমের বিশৃঙ্খল আচরণে অর্ধশতাধিক অসুখে মানুষ ভোগে এবং এসব রোগের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়ার ফলে গর্ভপাত ঘটে থাকে। ট্রাইসোমি এমন এক অবস্থা যখন ভুক্তভোগী নির্দিষ্ট অটোসোমের ৩ কপি বহন করে। যেমন সবচেয়ে পরিচিত **ডাউন সিন্ড্রোম** (একে ট্রাইসোমি 21–ও বলে)। এ ক্ষেত্রে শিশুদেহে ক্রোমোজোম ২১-এর তিনটি কপি থাকে। এ ধরনের জটিলতা নিয়ে ৮০০-১০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ আকৃতির চোখ, মুখ ও গাল, সে সঙ্গে মস্তিষ্কের ছোট আকৃতি, হৃদরোগ প্রভৃতি জটিলতা নিয়ে চরম মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে শিশু জন্ম নেয়, বেড়ে উঠে।

খ. টেরাটোজেন (Teratogens) জনিত সমস্যা

সফল গর্ভধারণই সুস্থ শিশুর জন্মদানের একমাত্র উপায় নয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি কোন পরিবেশে হচ্ছে সে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত। মনে রাখতে হবে, ভ্রূণ এমন কোনো অবস্থায় থাকে না যা পরিবেশের আওতার বাইরে। এ কারণে, দূষিত বহিঃপরিবেশ, মায়ের অসুস্থতা ও ওষুধ গ্রহণ কিংবা মাদক সেবন সবকিছুতে ভ্রূণের বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়। ভ্রূণ বৃদ্ধির প্রায় শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ৬–৮ সপ্তাহের মধ্যে যখন এটি বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রে সজ্জিত ফিটাসে পরিণত হবে সে সময়কালটি সবচেয়ে বেশি বিপদসংকুল। তখন বিভিন্ন পরিবেশিক কারণে অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গহানি ঘটে। এ সব বিকৃতি বা হানির জন্য যে কারণগুলো দায়ী সেগুলোই হচ্ছে টেরাটোজেন। নিচে কতকগুলো টেরাটোজেন ও মানবভ্রূণে তার কুফল আলোচনা করা হলো।

১. রুবেলা / জার্মান হাম (Rubella / German Measles) : ভ্রূণাবস্থায় রুবেলা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটে কিংবা ভূমিষ্ঠ হলেও অন্ধ, বধির, মানসিক প্রতিবন্ধী, হৃৎপিন্ড ও স্নায়ুতন্ত্রে ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

২. HIV ও হেপাটাইটিস B : এ ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত মাতৃদেহে বর্ধনশীল ভ্রূণ জন্মগত অঙ্গবিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং জীবনহরণকারী সংক্রমণ হিসেবে পরিচিত।

CamScanner

৩. সাইটোমেগালোভাইরাস (Cytomegalovirus, CMV) : এটি হারপিস গ্রুপভুক্ত ভাইরাস। পূর্ণবয়স্ক মানুষে এ ভাইরাস কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ করে না বলে এর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কিন্তু সন্তান জন্মগত পঙ্গু হয়ে জন্মায়। সিফিলিসের সংক্রমণে শিশু চোখ, কান ও মস্তিষ্কের খুঁত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

৪. দীর্ঘকালীন অসুস্থতা (Chronic illness) : হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও লুপাস (lupus) নামে চর্মক্ষত রোগ, ভ্রূণের পরিস্ফুটনে প্রভাব ফেলে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত মা'দের বিপাকীয় তারতম্যের কারণে যেভাবে রক্তে চিনির মাত্রার তারতম্য ঘটে এবং তার মাত্রা সঠিক রাখতে সুচিন্তিত ব্যবস্থা না নিলে ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. ধূমপান (Smoking) : ধূমপায়ী মায়ের ভ্রূণ বৃদ্ধিকালীন সময়ে মারাত্মক পুষ্টি সংকটে ভোগে ফলে কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তামাক (সিগারেট) জাতীয় দ্রব্যাদির প্রধান উপাদান নিকোটিন। নিকোটিন রক্তবাহিকার নালি সংকুচিত করে দেয় ফলে অমরায় রক্ত প্রবাহ ও পুষ্টি পদার্থের পরিমাণ কমে যায়, ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৬. মদপান : বর্ধনশীল ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করে অবাধে মদপান করলে ভূমিষ্ঠ শিশু যে অসুখে ভোগ তার নাম **ফিটাল অ্যালকোহল সিন্ড্রোম** (Foetal Alcohol Syndrome, সংক্ষেপে FAS)। যে মায়েরা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী বা অ্যালকোহলিক তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ যে সব ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার প্রকাশ ঘটে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর।

৭. খাদ্যগ্রহণ : গর্ভবতী মায়ের খাদ্য গ্রহণের বিষয়টি সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই অন্ততঃ এ বিষয়ে সজাগ যে ভ্রূণের স্বাভাবিক ও সুস্থ বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর ও বাড়তি খাবার প্রয়োজন। গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় নিউরাল নালির পরিস্ফুটনে ফলিক এসিডযুক্ত খাদ্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কোনো নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিংবা তা জানার আগেই ভ্রূণের নিউরাল নালির পরিস্ফুটন শুরু হয়ে যায়। অতএব, আহারের বাছ-বিচার অত্যন্ত জরুরী।

৮. মানসিক অবস্থা : ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সময়কালটি বাংলাদেশের ধনী-গরীব সব পরিবারই সচেষ্ট থাকে যেন মা ও শিশু সুস্থ থাকে। পরিবারে বয়স্ক সদস্যের নির্দেশও থাকে যেন মায়ের মন সবসময় আনন্দে থাকে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও এটি প্রমাণিত হয়েছে যে প্রফুল্ল থাকা মায়ের ভ্রূণ যেভাবে বর্ধিত হয় বিষন্ন মায়ের ভ্রূণ তেমনটি হয় না।

যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Diseases)

যেসব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সেসব রোগকে যৌনবাহিত রোগ (sexually transmitted diseases, STDs) বলে। চিকিৎসাবিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে রোগ (disease) বলে। যেহেতু অনেক সময় যৌনবাহিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না তাই এ অবস্থাকে যৌনবাহিত রোগ না বলে **যৌনবাহিত সংক্রমণ** (sexually transmitted infections) বলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাক না পাক সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো যৌনবাহিত রোগ নামেই বহুল পরিচিত। অনেক ধরনের যৌনবাহিত রোগ ও সংক্রমণ রয়েছে। কেবল নিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমেই এসব রোগ ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ বইয়ে সিলেবাসভুক্ত ৩টি যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস) এর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক. সিফিলিস (Syphilis)

সিফিলিস Spirochaete (স্পাইরোকিটি) জাতীয় ব্যাকটেরিয়াঘটিত একটি ক্রনিক যৌনবাহিত রোগ। নারী-পুরুষ সকলেই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পতিতালয়গুলো এ রোগের প্রধান উৎসকেন্দ্র। এ রোগে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দেয় এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। যৌনবাহিত রোগগুলোর মধ্যে সিফিলিসের অবস্থান শীর্ষে। ইতালিয়ান চিকিৎসক ও কবি Fracastoro (ফ্রক্যাসটোরো) কর্তৃক ১৫৩০ সালে রচিত একটি কবিতার শিরোনাম ও নায়ক Syphilus (সিফিলাস)- এর নামানুসারে এ রোগের নামকরণ করা হয়েছে সিফিলিস। ধারণা করা হয়, রোগটি আমেরিকা থেকে কলম্বাসের নাবিকদের মাধ্যমে ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রোগটি মহামারী আকারে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পরে। জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী Schaudinn & Hoffmann (চাউদিন এবং হফম্যান) ১৯০৫ সালে সিফিলিস রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

CamScanner

রোগের কারণ (Causative agent) : *Treponema pallidum* নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে মানুষের সিফিলিস রোগ হয়। ব্যাকটেরিয়াগুলো সরু, নমনীয়, সর্পিলাকার, উভয়প্রান্ত সূচালো, ফ্ল্যাজেলাবিহীন তবে সচল, গ্রাম নেগেটিভ, অণুবায়ুজীবী এবং অবলিগেট প্যাথোজেনিক পরজীবী। কোষদেহের দৈর্ঘ্য ৫ – ১৫ μm এবং প্রস্থ ০.১ – ০.২ μm।

সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of Transmission)

সিফিলিস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সৃষ্ট **সিফিলিটিক ক্ষত** (syphilitic sore)-এর সরাসরি সংস্পর্শে এলে জনান্তরে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিটিক ক্ষত প্রধানত বহির্যৌনাঙ্গ, যোনি, পায়ু বা মলাশয়ে অবস্থান করে, কিছু দেখা যায় ঠোঁট ও মুখে। যৌনমিলনের ধরনের উপর (যোনি, পায়ু, মুখ) সংক্রমণের উৎস নির্ভর করে। সিফিলিসে আক্রান্ত গর্ভবতী নারী সন্তান ভূমিষ্ঠের আগেই তার শরীরে সিফিলিস রোগের বিস্তার ঘটিয়ে দেয়। সিফিলিসের জীবাণুতে সংক্রমিত হলে সাধারণত ২১ দিনের মাথায় রোগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে, তবে ব্যক্তি বিশেষে সময়কাল ১০-৯০ দিন হতে পারে।

লক্ষণ (Symptoms)

সিফিলিসের প্রথম লক্ষণ যেমন বেশ দেরিতে (অর্থাৎ ২১ দিন পর) প্রকাশ পায় তেমনি শেষ পর্যায়ে যেতেও অনেক সপ্তাহ, মাস বা বছর পেরিয়ে যায়। লক্ষণ প্রকাশের সময়কালকে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

১. প্রাথমিক পর্যায় (Primary stage) : ২১ দিন পর ১টি মাত্র সিফিলিটিক ক্ষত প্রকাশিত হয়। এটি দৃঢ়, গোল ও ব্যথাহীন ক্ষত। এটি দেখে বোঝা যায় জীবাণু কোন পথে সংক্রমিত হয়েছে। তিন থেকে ছয় সপ্তাহ পর ক্ষতপূরণ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে ধাবিত হয়।

চিত্র ৯.২৬ : সিফিলিস রোগের লক্ষণসমূহ

২. মাধ্যমিক পর্যায় (Secondary stage) : গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি (rash) দেখা দেয়া এবং সিফিলিটিক ক্ষত অমসৃণ, লাল বা লালচে বাদামী দাগ হিসেবে হাত-পায়ের তালুতে আবির্ভূত হওয়া এ পর্যায়ের লক্ষণ। ক্ষত ছাড়াও জ্বর, স্ফীত লসিকা গ্রন্থি, গলাভাঙ্গা, বিভিন্ন জায়গায় চুল উঠে যাওয়া, মাথাব্যথা, ওজন কমে যাওয়া, পেশিব্যথা, ক্লান্তি প্রভৃতিও এ পর্যায়ে দেখা দেয়।

৩. সুপ্ত পর্যায় (Latent stage) : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লক্ষণগুলো অদৃশ্য হলে শুরু হয় সুপ্ত পর্যায়। এ সময় আক্রান্তের দেহে কোনো ক্ষত, ফুসকুড়ি বা অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায় না। বছরের পর বছর এ পর্যায় অব্যাহত থাকতে পারে।

৪. বিলম্বিত পর্যায় (Late stage or Tertiary stage) : যদি সিফিলিস আক্রান্ত রোগী উপযুক্ত চিকিৎসা না নেন তবে তার ক্ষেত্রে Tertiary syphilis হতে পারে। আক্রান্ত হওয়ার ১০–৩০ বছর পরও এটি হতে পারে। রোগের বিলম্বিত দশায় রোগীর মস্তিষ্ক, স্নায়ু, চোখ, হৃৎপিন্ড, রক্তকণিকা, যকৃত, গ্রন্থি ও সন্ধির ক্ষতি সাধন করে। ফলে পেশি সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে, দেখা দেয় পঙ্গুত্ব, অন্ধত্ব, হতবুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত। এ অবস্থায় মানুষের মৃত্যু ঘটে।

CamScanner

রোগ নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিকার (Disease Control or Remedy)

প্রতিরোধ

১. পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা।
২. অনিয়ন্ত্রিত যৌনমিলন পরিহার করে সুস্থ জীবন-যাপন ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।
৩. সিফিলিস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা।
৪. যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা।
৫. বহুগামিতা পরিহার করা।
৬. বিবাহপূর্ব ছেলেমেয়ে, গর্ভবতী মা এবং রক্তদানকারী ব্যক্তিদের ভিডিআরএল টেস্ট (VDRL Test) করানো, টেস্ট পজেটিভ হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৭. সমাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ রোগের কুফল এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার চালানো।

চিকিৎসা

সিফিলিসের লক্ষণ জানা থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে সহজেই চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়। কারও দেহে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায় বা প্রাক-সুপ্ত পর্যায়ের সিফিলিস জীবাণু থাকলে তাকে একটি মাত্র Benzathine Penicillin-G ইনজেকশন দিলেই রোগ দূর হতে পারে। সুপ্ত পর্যায়ের শেষ অবস্থায় থাকলে তাকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ইনজেকশন দিতে হয়। চিকিৎসার ফলে সিফিলিস সারবে কিন্তু দেহের ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুর ক্ষত পূরণ হবে না। সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত যৌন মিলন থেকে নিজেকে বা অন্যকে বিরত রাখতে হবে।

খ. গনোরিয়া (Gonorrhea)

Neisseria gonorrhoeae নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে মানুষের গনোরিয়া রোগ হয়। এ রোগের জীবাণুর সাধারণ নাম Gonococcus। ব্যাকটেরিয়াগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার বা বৃক্কাকার, ক্যাপসুলবিহীন, স্পোর অনুৎপাদক, ফ্ল্যাজেলাবিহীন, নিশ্চল, ফিম্ব্রি বা পিলিযুক্ত, গ্রাম নেগেটিভ, বায়ুজীবী এবং অবলিগেট প্যাথোজেনিক পরজীবী। কোষদেহের ব্যাস ০.৬ μm - ১.০μm। কোষগুলো সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। মানবদেহের বাইরে এরা বেশিক্ষণ জীবিত থাকতে পারে না। শুষ্কতায় এরা অতি সহজেই মারা যায়। *N. gonorrhoeae* নারীর জনন নালি (সারভিক্স, জরায়ু, ফেলোপিয়ান নালিসহ) এবং নারী ও পুরুষের ইউরেথ্রার (মূত্রনালি) মিউকাস ঝিল্লিতে সংক্রমণ ঘটায়। মুখ, গলা, চোখ ও পায়ুর মিউকাস ঝিল্লিও এ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। গর্ভকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা-বন্ধ্য হয়ে যেতে পারে।

সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of Transmission)

যৌন মিলনের সময় আক্রান্ত দেহের বহির্যৌনাঙ্গ, মুখ ও পায়ু থেকে সংক্রমণ ঘটে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও আক্রান্ত মাতৃদেহ থেকে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যে ব্যক্তি এক সময় গনোরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসায় সেরে উঠেছে এমন ব্যক্তি গনোরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে পুনর্মিলন ঘটালে সেও পুনঃসংক্রমিত হতে পারে। গনোরিয়ায় আক্রান্ত অনেক ব্যক্তির দেহে তেমন স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলে এটি ব্যাপক বিস্তৃত যৌনবাহিত অসুখ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

লক্ষণ (Symptoms)

পুরুষে গনোরিয়ার লক্ষণ : আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের ২–১৩ দিনের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়।
১. পেনিসের মাথা প্রথমে লাল হয়ে ওঠে ও চুলকায়। পরবর্তীতে সেখান থেকে পুঁজ নির্গত হয়।
২. পেনিসে জালাপোড়া হয়, প্রস্রাবের তীব্রতা, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়।
৩. কুচকির লসিকাগ্রন্থি ফুলে যায় ও ব্যথা হয়।
৪. সেমিনাল ভেসিকল আক্রান্ত হলে রক্তপূর্ণ বীর্যপাত হয় এবং ব্যথা হয়।
৫. প্রস্টেট আক্রান্ত হলে পায়ুর সম্মুখে ব্যথা হয় এবং মলত্যাগের সময় ব্যথা বেড়ে যায়।
৬. সাধারণত জ্বর জ্বর ভাব থাকে।
৭. দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, মস্তিষ্কে প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্ষত হতে পারে।

CamScanner

নারীতে গনোরিয়ার লক্ষণ : পুরুষের চেয়ে মহিলা এ রোগে কম আক্রান্ত হয়।

১. সংক্রমণের কারণে যোনির ওষ্ঠে লাল ও দগদগে ঘা হয়।
২. যোনিপথে অস্বাভাবিক সাদা ও হলুদ বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়।
৩. প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়।
৪. ডিম্বনালি আক্রান্ত হলে এটি পুঁজ দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ফলে সন্তান ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
৫. তলপেটে ব্যথা হয়।
৬. মাসিক অনিয়মিত হয় ও তীব্র ব্যথা হয়।
৭. দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, মস্তিষ্কে প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডে ক্ষত হতে পারে।
৮. পায়ুপথে সংক্রমিত হলে পায়ুপথে তীব্র প্রদাহ ও রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। মায়ের এরোগ থাকলে শিশু অপথালমিয়া নিওন্যাটোরাম (Ophthalmia neonatorum) নামক চোখের প্রদাহ নিয়ে জন্ম নিতে পারে।

Neisseria gonorrhoeae (পরজীবী) রোগের লক্ষণ

চিত্র ৯.২৭ : গনোরিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

রোগ নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিকার (Disease Control or Remedy)

প্রতিরোধ

১. পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা।
২. অনিরাপদ যৌনমিলনে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান মেনে চলা।
৩. যৌন সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক থাকা।
৪. যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা।
৫. বহুগামিতা পরিহার করা।
৬. এ রোগের কুফল এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো।

চিকিৎসা

রোগটি শনাক্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো পেনিসিলিন, সেফিক্সিম, টেট্রাসাইক্লিন, ডক্সিসাইক্লিন, এরিথ্রোমাইসিন, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের যে কোনো একটি সেবন বা ইনজেকশন গ্রহণ করলে রোগটি সেরে যায়। স্বামী-স্ত্রী বা যৌন সঙ্গী যে কোনো একজনের এ রোগ থাকলে উভয়েরই পূর্ণ কোর্স চিকিৎসা নিতে হবে।

গ. এইডস (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome)

AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (ডেফিসিয়েন্সি বা হ্রাস) Syndrome (সিনড্রোম বা অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ, **বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়াকে এইডস** (AIDS) বলে। Human Immunodeficiency Virus, সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়। HIV ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের শ্বেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T_4 লিম্ফোসাইট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যায়। বর্তমান বিশ্বে AIDS একটি মারাত্মক রোগ। ২০১২ সালের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬ মিলিয়ন মানুষ এইডস রোগে মারা গেছে এবং আরো প্রায় ৩৫.৩ মিলিয়ন মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত। এইডস বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত (pandemic) একটি ভয়াবহ যৌন রোগ যা প্রতিনিয়ত আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

CamScanner

ধারণা করা হয় বানরের দেহে এই ভাইরাসটি ছিল যা সর্বপ্রথম আফ্রিকায় বানর থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে তা আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী Dr. Lue Montagnier এবং আমেরিকার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট এর Dr. Robert Gallo 1984 সালে পৃথকভাবে AIDS এর জীবাণু আবিষ্কার করেন। ভয়াবহতার নিরিখে এইডস সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৮৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১লা ডিসেম্বরকে বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। বর্তমানে এক লুপ বিশিষ্ট লাল ফিতাকে বিশ্বজুড়ে এইডস-এর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চিত্র ৯.২৮ : লালফিতা; HIV পজেটিভ ব্যক্তি ও এইডস-এ আক্রান্তদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের প্রতীক।

AIDS-এর বিস্তার (Spread of AIDS)

বিভিন্ন উপায়ে এইডসের ভাইরাস একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যেমন– নারী-পুরুষের অস্বাভাবিক ও অসামাজিক যৌন আচরণ, সংক্রমিত সিরিঞ্জ ব্যবহার, সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ, সংক্রমিত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশু, সেলুনে একই ব্লেড বা ক্ষুর বিভিন্ন জনে ব্যবহার করা, দন্ত চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা গ্রহণকারী ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ

এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর শ্বেতরক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ফলে রোগীর দেহ ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাতে থাকে এবং নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে–

১. প্রাথমিক অবস্থায় দেহে জ্বর আসে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বর দীর্ঘায়িত হয়।
২. দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ফুলে যায় এবং শরীর শুকিয়ে যায় ও ওজন কমতে থাকে।
৩. পেটে ব্যথা হয় এবং খাবারে অনীহা সৃষ্টি হয়।
৪. ফুসফুসে জীবাণুর আক্রমণ ঘটে এবং বুকে ব্যথাসহ শুষ্ক কফ জমে।
৫. অস্থিসন্ধিসমূহে প্রচন্ড ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং দেহে জ্বালাপোড়া হয়।
৬. শ্বাসকষ্ট, জিহ্বায় সাদা স্তর জমা, ত্বকের মিউকাস ঝিল্লি বা যে কোনো ছিদ্র থেকে রক্তপাত, ঘন ঘন ফুসকুড়ি, সার্বক্ষণিক মাথা ব্যাথা এবং ক্রমশঃ স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়।
৭. সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগী যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অন্ধত্ব প্রভৃতি একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

চিত্র ৯.২৯ : বায়ে-HIV ভাইরাস ও ডানে-এইডস এর লক্ষণসমূহ

এইডস-এর লক্ষণ নারী-পুরুষে প্রায় এক রকম হলেও নারীদেহে কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, যেমন–যোনিতে দীর্ঘস্থায়ী বা অনিরাময়যোগ্য ঈস্টের সংক্রমণ। এ সংক্রমণ সুস্থ নারীদেহে দ্রুত সেরে যায়। জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণজনিত প্রচন্ড জ্বালাপোড়া ও ব্যথা সৃষ্টি হয়। জরায়ু-গাত্রে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)-এর আক্রমণে টিউমার হওয়া এবং পরবর্তীতে সার্ভিক্স ক্যান্সারে রূপ নেয়া আরেকটি লক্ষণ।

রোগ নির্ণয়

রক্তের পরীক্ষার মাধ্যমে দেহে HIVএর সংক্রমণ নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে রক্তের যেসব পরীক্ষা করা হয় সেগুলো হলো– HIV অ্যান্টিবডি টেস্ট, RNA টেস্ট, p24 protein টেস্ট, ওয়েস্টার্ণ ব্লট (Western blot) টেস্ট ইত্যাদি। AIDS আক্রান্ত রোগীর রক্তে T-helper cells বা CD4 cell গণনা করার জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। রক্তে যদি CD4 cell এর পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকে তাহলে বুঝা যায় HIV অনাক্রম্যতন্ত্রকে ধ্বংস করছে (রক্তের স্বাভাবিক CD4 cell এর পরিমাণ 500 – 1,500 cells/mm^3)।

প্রতিকার

প্রতিরোধ : এইডস প্রতিরোধে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

১. নিরাপদ যৌনমিলন করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান মেনে চলা।
২. যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করা।
৩. অস্বাভাবিক যৌনমিলন, বহুগামিতা, সহকামিতা এবং পতিতাগামিতা পরিহার করা।
৪. যৌনসঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক থাকা।
৫. পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা।
৬. HIV আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন ও চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকা।
৭. এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান ধারণ অথবা সন্তানকে বুকের দুগ্ধ পান করানো থেকে বিরত রাখা।
৮. রক্ত গ্রহণের পূর্বে HIV সংক্রমিত কিনা তা পরীক্ষা করা।
৯. ইনজেকশন গ্রহণের সময় পরিশোধিত বা নতুন সিরিঞ্জ ও সুঁই ব্যবহার করা।
১০. শল্য চিকিৎসায় জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা।
১১. সেলুনে ক্ষৌরকর্মে ক্ষুরের পরিবর্তে প্রতিবার একটি নতুন ব্লেড ব্যবহার করা।
১২. ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের এইডস-এর জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা।
১৩. HIV সংক্রমিত ব্যক্তিকে শনাক্ত করে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রেখে চিকিৎসা প্রদান করা।
১৪. গণমাধ্যমসমূহের দ্বারা ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এইডস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

চিকিৎসা

এইডস রোগ নিরাময়ের সফল কোনো ওষুধ বা প্রতিরোধের কোনো ভ্যাকসিন আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তবে এর সংক্রমণ বিলম্বিত করতে এবং তীব্রতা কমাতে চিকিৎসক কিছু ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বর্তমানে **এন্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি** (Antiretroviral therapay, ART) দ্বারা এইডস রোগের চিকিৎসা করা হয়। এ চিকিৎসায় তিন প্রকার ওষুধ ব্যবহৃত হয়, যথা- ১. নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর (NRTI) গ্রুপের ওষুধ, যেমন– Zidovudine, Azidothymidine ইত্যাদি; ২. নন-নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর (NNRTI) গ্রুপের ওষুধ, যেমন- Delviridine, Nevirapine ইত্যাদি এবং ৩. প্রোটিয়েজ ইনহিবিটর (PI) গ্রুপের ওষুধ, যেমন- Indinavir, Ritonavir ইত্যাদি। NRTI গ্রুপের ওষুধ HIV এর রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ এনজাইমকে অকেজো করে প্রতিলিপি সৃষ্টিতে বাঁধা দেয়। অন্যদিকে NNRTI ও PI গ্রুপের ওষুধ HIV এর প্রোটিয়েজ এনজাইমকে নিষ্ক্রিয় করে সংক্রমণ বিলম্বিত করে। এইডস চিকিৎসায় এক প্রকার ওষুধ কম কার্যকর, তাই সম্মিলিতভাবে ওষুধ দেয়া হয়।

CamScanner

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ সত্ত্বা ও আকৃতি বিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখে তাকে প্রজনন বলে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী তাই পুরুষদেহে পুংজননতন্ত্র ও স্ত্রীদেহে স্ত্রীজননতন্ত্র বিদ্যমান।

২. মানবজীবনের যে পর্যায়ে নারী-পুরুষের দেহে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশ ঘটে ও জনন অঙ্গসমূহ সক্রিয়তা লাভ করে তাকে বয়ঃসন্ধি বলে। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ–এ দুয়ের সন্ধিকালই হলো বয়ঃসন্ধিকাল।

৩. বয়ঃসন্ধির পর থেকে অর্থাৎ যৌবন প্রাপ্তির পর থেকে নারীদের জননাঙ্গে নিয়মিত যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে স্ত্রীযৌন চক্র বলে। গর্ভধারণকালীন সময়ে এ চক্র সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। পুরুষদের কোনো যৌন চক্র থাকে না।

৪. যৌন চক্রের সময় ডিম্বাশয়ে যেসব ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে (যেমন– ফলিকল→ গ্রাফিয়ান ফলিকল → ডিম্বনিঃসরণ → করপাস লুটিয়াম গঠন ইত্যাদি) তাকে ডিম্বাশয় চক্র বা ওভারিয়ান চক্র বলে। অপরদিকে জরায়ুর প্রাচীর ও এন্ডোমেট্রিয়ামের পরিবর্তনকে বলা হয় জরায়ু চক্র।

৫. স্ত্রীলোকে সমগ্র যৌনজীবনকালে প্রতি ২৮ দিন অন্তর প্রথম ৩–৫ দিন ধরে জরায়ুর অন্তঃস্থ স্তর বা এন্ডোমেট্রিয়ামের অবক্ষয়ের ফলে রজঃস্রাব এবং পরে দেহের অন্যান্য অঙ্গসমূহের যেমন– ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদির যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় রজঃচক্র।

৬. পুরুষে সারাজীবন ধরে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। কিন্তু নারীদের ৪০–৫০ বছরের মধ্যে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু উৎপাদন ও রজঃস্রাব উভয়ই বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থাকে মেনোপোজ বা রজঃনিবৃত্তি বলে।

৭. যে পদ্ধতিতে যৌন জননক্ষম প্রাণিদের জননকোষ সৃষ্টি হয় তাকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। যে পদ্ধতিতে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস এবং যে পদ্ধতিতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তাকে বলে উওজেনেসিস।

৮. বর্ধনশীল মানব ভ্রূণ জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হওয়ার কৌশলকে ইমপ্লানটেশন বলে। নিষেকের ৭–৮ দিনের মধ্যে ভ্রূণ জরায়ুর পৃষ্ঠদিকের এন্ডোমেট্রিয়াম প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়।

৯. অমরা বা প্লাসেন্টা হলো মাতৃটিস্যু ও ভ্রূণটিস্যু নিয়ে গঠিত অস্থায়ী অঙ্গ যার মাধ্যমে ভ্রূণ মাতৃদেহ হতে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং নিজ দেহ থেকে বর্জ্য বহিষ্কার করে। মানুষের ভ্রূণ গঠনের ১২ সপ্তাহ পরে অমরা গঠিত হয়।

১০. নাভি রজ্জু বা আমবিলিকাল কর্ড হলো জরায়ুতে বিকাশমান ফিটাস ও অমরার মধ্যে সংযোগকারী প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার লম্বা রজ্জু আকৃতির একটি গঠন যাতে দুটি ধমনি ও একটি শিরা থাকে। এর মাধ্যমে শিশু অমরা হতে রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং বর্জ্য ত্যাগ করে।

১১. দেহের বাইরে কৃত্রিমভাবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে জাইগোট তৈরি করে জাইগোটটিকে পুনরায় জরায়ুর ভিতরে স্থাপন করে যে গর্ভধারণ করা হয় তাকে ইন ভিট্রো ফারটিলাইজেশন= IVF বলে। এ পদ্ধতি সাধারণভাবে টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতি নামে পরিচিত। IVF বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি।

১২. যেসব রোগ মানুষের যৌন আচরণের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় তাদের যৌনবাহিত রোগ বা ভেনারিয়েল ডিজিস বলে।

১৩. *Treponesa pallidum* জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত এক ধরনের যৌনবাহিত রোগের নাম সিফিলিস। পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, ঘা থেকে পরবর্তীতে হাত, পা, তালুতে ক্ষত, লসিকা গ্রন্থি বৃদ্ধি এবং পরে অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের ফলে অন্ধত্ব, প্যারালাইসিস এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

১৪. *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গনোরিয়া রোগ সংক্রমিত হয়। এটি এক ধরনের যৌনবাহিত রোগ। জনন পথে, মুখ, গলা ও পায়ুতে এর ব্যাকটেরিয়া বেড়ে উঠতে পারে। আক্রান্ত অঙ্গগুলোর প্রদাহ, পুঁজ সৃষ্টি হওয়া ও ক্রমাগত জ্বর ভাব থাকে। অবৈধ ও অনিরাপদ যৌন মিলনে এ রোগ ছড়ায়।

১৫. HIV সংক্রমণের ফলে রোগীর শরীরে সংক্রমণ উত্তর অবস্থাকে এইডস বলা হয়। ১৯৮৩ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ড. লুই মনট্যাগনিয়ার এবং ১৯৮৪ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী ড. রবার্ট গ্যালো পৃথকভাবে এইডস এর ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

CamScanner